পতাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রথম সংস্করণ
আষাঢ় ১৩৫৪

দুই টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনু্য, কলিকাতা
হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ছবি মিত্র

করকমলেষু

লেখকের অন্যান্য বই :—

অসমতল

হলদে বাড়ি

দ্বীপপুঞ্জ

উল্টোরথ

ক্রৌঞ্চমিথুন

পদক

নাম

কুলপী বরফ

ঘুষ

পতাকা

ক্রৌঞ্চমিথুন

নতুন ভাড়াটের জন-সংখ্যা দেখে বাড়ির অন্য চার ঘর ভাড়াটের প্রত্যেকে ভারি তৃপ্তি বোধ করল। সংখ্যায় মাত্র দুজন, স্বামী আর স্ত্রী—একটি সংসারের একেবারে সংক্ষিপ্ততম রূপ। ছেলেপুলের ঝামেলা নেই, বাড়তি আত্মীয় স্বজন নেই, অনুক্ষণ বকবক করবার জন্য একটি বুড়ি মা পর্যন্ত এদের সঙ্গে আসেনি, একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট, বাহুল্যহীন একঘর আদর্শ ভাড়াটে।

এদের আগে উত্তর পশ্চিম কোণের এই ঘরটাতেই ছিল কুঞ্জ কম্পাউণ্ডার। স্ত্রী, ছ'টি ছেলেমেয়ে আর একটি খিটখিটে মেজাজের মা তো ছিলই এর পরে আবার মাঝে মাঝে কুটুম্বস্বজনও এসে উদয় হোত, শাশুড়ী গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এসে দু একমাস কাটিয়ে যেত, শালী আসত চোখের চিকিৎসার জন্য, কুঞ্জ কাউকে না ক'রত না, নির্বিচারে নির্বিকার মনে সবাইর জন্যই ঘরের দোর খুলে রাখত। যত ঝক্কি পোহাতে হোত অন্যান্য ভাড়াটেদের চৌবাচ্চায়। জল পাওয়া যেতনা, সদরের সরু পথটুকুর মধ্যে পা ফেলবার জো থাকত না, সেখানেও কুঞ্জের সন্তান আর স্বজনেরা ছড়িয়ে থাকত।

সেই জায়গায় এরা এল কেবল দুজন, মন্মথ আর লতা। স্বাস্থ্যবান ছাব্বিশ সাতাশ বছরের যুবক আর একুশ বাইশের ফর্সা আর

ছিপছিপে গড়নের একটি বউ, দেখে প্রত্যেকের মনই প্রসন্ন হয়ে উঠল, পাশের ঘরেব প্রৌঢ় বিপিনবাবু বললেন, 'এতদিনে বাড়ির শোভা বেড়েছে।'

দোতলার বুড়ো নিবারণ বাঁড়ুয্যে ছেলেপুলের কান এড়িয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'ভারি চমৎকার মিলেছে। ওদের দেখে বছর তিরিশেক আগেকার দিনগুলির কথা মনে পড়ে। তখন দেখতে তুমি ঠিক ওই রকমটি ছিলে।'

নিভাননীর সামনের দু' তিনটি দাঁত নেই। হাসিতে তবু যেন সেই কৈশোরের লজ্জা এসে দেখা দিল, স্বামীর চোখেব সামনে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'কি যে বল।'

নিবারণবাবুর মেজ ছেলে বিনয় কলেজে পড়ে, সে এরই মধ্যে দু' তিনবার এসে মন্মথদের সঙ্গে আলাপ ক'রে গেল। বলল, 'কোন রকম দরকার হ'লেই ডাকবেন। একেবাবে পর মনে করবেন না যেন বউদি।'

লতা খাটো ঘোমটার আড়াল থেকে মৃদু হেসে জবাব দিল, 'পর কেন মনে ক'রব, এখানে আপনারাই তো সবচেয়ে আপন।'

কিন্তু সপ্তাহ খানেক কাটতে না কাটতেই সবাইর ধারণা আর সম্বন্ধ দুইয়েরই পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল।

মন্মথদের ঠিক সামনে দুখানা ঘর নিয়ে থাকে বিভূতি, কোন্ এক মার্চেণ্ট অফিসে কাজ করে। তার মা কাত্যায়নী এসে সেদিন লতাদের ঘরের সামনে দাঁড়ালেন, 'তোমার আঁশ বঁটিখানা দাওতো মা।

বাজার থেকে একটা গোটা ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছে ছেলে, কিন্তু বঁটিখানার দশা এমন যে চোরের নাক কাটেনা। কোন দিকে যদি একটু লক্ষ্য থাকে বউয়ের, তোমার বঁটিখানা একবার যদি দিতে মাছটা কুটে নিতুম।'

লতা বলল, 'কিন্তু ও বঁটিতে তো আপনি মাছ কুটতে পারবেন না মাসীমা।'

কাত্যায়নী অবাক হয়ে বললেন, 'কেন, তোমার তো বেশ নতুন বঁটি, দিব্যি ধার আছে।'

লতা বলল, 'তা আছে, কিন্তু বাঁটের ভিতরে ভাল করে বসেনা, ভারি ঢল ঢল করে।'

কাত্যায়নী সস্নেহে হাসলেন, 'তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ মা, এই তো খানিক আগেও দেখলুম তুমি বসে বসে দিব্যি মাছ কুটছ, বঁটি একটুও ঢল ঢল ক'রছে না।'

লতার মুখ বেশ কঠিন দেখাল, মুখের কথাগুলি শোনাল আরো শক্ত। লতা বলল, 'আমার হাতের জিনিস আমার হাতে ঢল ঢল ক'রবে কেন মাসীমা কিন্তু অন্যের হাতে একবার গেলে ওতে আর কোন পদার্থ থাকবেনা। আমাব অনেক দেখা আছে। আর নিজেদের ব্যবহারের জিনিস উনি কাউকে দেওয়া পছন্দ করেন না।'

কাত্যায়নী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'সে কথা আগে বললেই পারতে বাছা, তার জন্য অমন ছল-চাতুরী করবার তো কোন দরকার ছিলনা। বাবারে বাবা, সোনা নয় দানা নয়, সামান্য একখানা আঁশবঁটি। খেয়ে আমরা হজম করে ফেলতাম না বউ।'

ওপরে নীচে সঙ্গে সঙ্গে কথাটা রটনা হয়ে গেল। এমন কেউ কোনদিন শুনেছে না দেখেছে। বুড়ো মানুষের মুখের ওপর একেবারে স্পষ্ট ব'লে দিল, 'দোবনা', চক্ষুলজ্জায় বাধল না একটুও।

কাছেই মল্লিক কোম্পানীর এ্যাম্পুল ফ্যাক্টরীতে কাজ করে মন্মথ। খাওয়া দাওয়া সেরে ন'টার মধ্যেই বেরোয়। সযত্নে পান সেজে স্বামীর হাতে তুলে দিতে দিতে লতা বলল, 'শুনেছ, সেই বঁটি নিয়ে সমস্ত বাড়ি ভ'রে আমার বিরুদ্ধে ফিস ফিস গুজ গুজ চলছে। নিজের বঁটি অন্যের হাতে নষ্ট করতে দিইনি, ভারি দোষ হয়ে গেছে আমার।'

স্ত্রীর অভিমানক্ষুব্ধ মুখখানার দিকে তাকিয়ে মন্মথ মৃদু হাসল, 'দোষ হয়ে গেছে নাকি? তাই তো, বড ভাবনার কথা। দাঁড়াও, ফেরার পথে বাজার থেকে আধ ডজন বঁটি নিয়ে আসব। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে একখানা করে বিলিয়ে দিয়ো।'

হাসি চেপে কোপের ভঙ্গিতে লতা বলল, 'আর জ্বালিওনা। তোমার তো সব কথাতেই রহস্য। এদিকে বাড়িশুদ্ধ লোক যে পিছে লাগল সে খেয়াল আছে?'

চুনশুদ্ধ পানের বোঁটার মাথাটুকু দাঁতে কেটে নিল মন্মথ। বাকি অংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ চারটি আঙুল দিয়ে লতার ছোট সুন্দর চিবুকটি তুলে ধরে বলল, 'আছে গো আছে, কিন্তু তাতে ভয়টা কি। বাড়িশুদ্ধ লোক তো ভালো, দেশশুদ্ধ পিছে লাগলেও কিছু এসে যাবে নাকি আমাদের? কারো তোয়াক্কা রাখি নাকি

আমরা ?' বলে মন্মথ মুখখানা স্ত্রীর মুখের কাছে আরও এগিয়ে নিল।

পাশের ঘর থেকে বিপিনবাবুর স্ত্রী কনকলতার কর্কশ রুক্ষ কণ্ঠ শোনা গেল। বড় মেয়ে বীণাকে ধমকাচ্ছেন, 'হতভাগী, লক্ষীছাড়ী ফের যদি এই জানালায় এসে দাঁড়াবি কেটে কুচি কুচি করে ফেলব। ছি ছি ছি দিনে দুপুরে একি ব্যাভার, সভ্যতা ভব্যতা বলে কি কিছু নেই গা ? সব কি উঠে গেছে সংসার থেকে ? এটা কি গেরস্ত বাড়ি না বেশ্যাবাড়ি, আজই জিজ্ঞেস করব বাড়িওয়ালাকে। তিনি থাকুন আর তাঁর পেয়ারের ভাড়াটে থাকুক। এমন হলে এ বাড়িতে স্বামীপুত্র ঝি বউ নিয়ে আর কারো বাস করা চলবেনা।'

মন্মথ আর লতা সকৌতুকে পরস্পরের দিকে তাকাল, লতা লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'নাও হোল তো ? এই নিয়ে দেখবে এখন কি হয়।'

মন্মথ পকেট থেকে একটা বিড়ি বার ক'রে দুই ঠোঁটের মধ্যে চেপে দিয়াশলাই জ্বালল ; তারপর নিতান্ত অবজ্ঞার সুরে বলল, 'হোক গে।'

বিড়ি টানতে টানতে সগর্বে মন্মথ কাজে বেরিয়ে গেল।

লতা যা ভেবেছিল তাই, তাদের আচরণ নিয়ে সমস্ত বাড়িতে অন্তত বার দশেক বৈঠক বসল, কলতলায় গিয়ে শুনল বিভূতির বউ বাসন্তীর সঙ্গে কনকলতার এই আলোচনাই চলছে। ছাতে কাপড় মেলতে গিয়ে দেখল নিভাননী বীণাকে ডেকে সকৌতুকে কি

জিজ্ঞাসাবাদ ক'রছেন, দু'একটা কথা কানে যেতে লতা সেখান থেকে নেমে এল।

খেয়েদেয়ে বিছানা পেতে লতা দুপুরবেলায় একটু ঘুমাবার আয়োজন ক'রছে ছেলে কোলে নিয়ে বাসন্তী এল আলাপ জমাতে। একথা ও কথার পর বলল, 'তখন কি ব্যাপারটা হয়েছিল বল দেখি।'

লতা কঠিন স্বরে বলল, 'সে তো আজ দিন ভ'রেই শুনছেন।'

বাসন্তী ভাব জমাতেই এসেছিল কিন্তু লতার ভঙ্গি দেখে মনে মনে চটে উঠল, বলল, 'তবু তোমার মুখ থেকে একবার শুনতে চাই ভাই। বাহাদুরী আছে বটে তোমাদের। এতখানি বয়স হোল তিন তিনটি ছেলে মেয়ে হোল, কিন্তু সোয়ামীর কাছ থেকে এমন সোহাগ কোন দিন ভাই পাইনি। দিনে, দুপুরে, এক বাড়ি লোকের চোখের ওপর—। তোমাদের বাহাদুরী স্বীকার করতেই হবে, বিয়ে তো একদিন আমাদেরও হয়েছিল।'

লতা বলল, 'কিন্তু আমাদের তো বিয়ে হয়নি।'

বাসন্তী অবাক হয়ে বলল, 'বিয়ে হয়নি বলকি।'

লতা ফিস ফিস ক'রে বলল, 'হ্যাঁ দিদি, বলবেন না যেন কাউকে বিয়ে আমাদের হয়নি, আমরা অমনিই—'

বাসন্তী খানিকক্ষণ কাঠ হয়ে থেকে বলল, 'সত্যি বলছ?'

লতা বলল, 'হ্যাঁ দিদি সত্যিই, কিন্তু দোহাই আপনার কাউকে ব'লে দেবেন না যেন।'

লতা যেন আর হাসি চেপে রাখতে পারে না।

বাসন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে রূঢ় স্বরে বলল, 'ঠাট্টা

করো আর যাই করো, তোমাদের ভাব দেখে কিন্তু তাই মনে হয়, গেরস্ত ব'লে ধারণা হয়না।'

আহত এবং অপমানিত বাসন্তী মুখ কালো ক'রে তৎক্ষণাৎ লতাদের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর দোর ভেজিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে ঘর ভরে লুটোপুটি খেতে লাগল লতা।

রাত্রে স্বামীর বাহুবন্ধনের মধ্যে থেকে দুপুরের কথা মনে পড়ায় হাসির তোড়ে লতা আবার অস্থির হয়ে উঠল।

মন্মথ বলল, 'ব্যাপার কি, হাসছ কেন অত।'

কাহিনীর সমস্তটুকু শুনে মন্মথও ভারি কৌতুক বোধ ক'রল, বলল, 'এতও পারো তুমি। এরপর সমস্ত বাড়ি শুদ্ধ লোক কেবল চিড়বিড় ক'রবে।'

লতা বলল, 'কেবল চিড়বিড় ক'রবে না গো, বাড়ি থেকে তাড়াতেও চেষ্টা ক'রবে, গেরস্ত বাড়িতে এমন অনাচার কি সয়। দেখবে কালই বাড়িওয়ালা নোটিশ দিয়েছে।'

মন্মথ বলল, 'না গো না, অত সহজে পড়বেনা নোটিশ। বার টাকার ঘরের আঠার টাকার ভাড়া দিচ্ছি আমরা।'

গর্বে এবং আনন্দে স্বামীর বক্ষলগ্ন হয়ে থাকে লতা। সেই দিন আর নেই। সেই শাশুড়ী ননদের নির্যাতন, জা'দের টীপ্পনী টিটকারি, দেবর ভাসুরদের দুর-দুর সর-সর-এর দিন মন্মথ আর লতা পার হয়ে এসেছে। এখন বার টাকার ঘর আঠার টাকায় ভাড়া নিতেও তারা পিছোয় না, দু টাকার শাড়ি দশ টাকায় পরে,

দু'বেলায় মাছ তরকারী দিয়ে পেট ভরে খায়। দু'হাতে কামায় মন্মথ। আর সব এনে দেয় লতার হাতে। স্বামীর সঙ্গে অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা অনুভব করে লতা। মন্মথ শুধু তার, একান্ত করে লতারই। দেবর ভাসুরদের বৃহৎ পরিবার থেকে লতা তাকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছে। তাদের দুর্ব্যবহারের চরম প্রতিফল তারা পাক। বুঝুক মানুষের সব দিন সমান যায় না, সুখ দুঃখের ভাগ্য চাকার মত ঘোরে।

মন্মথও খুসি, এতকাল বিয়ে ক'রেও বুঝতে পারেনি যে বিয়ে ক'রেছে। যে রোজগার ক'রতে পারে না, মা ভাই তার নয়, বউ তার নয়, তাকে একটি জিনিস হাতে ক'রে দেওয়ার তার ক্ষমতা নেই, তার সঙ্গে একটু হেসে কথা বলতে গেলে বাড়ি ভরে জোড়ায় জোড়ায় চোখ তার দিকে চেয়ে থাকত। কারো চোখে শাসন, কারো চোখে তিরস্কার, কারো চোখে বিদ্রূপ।

সেই চোখের খোঁচা সহ্য করতে না পেরে গাঁয়ের বাড়ি ছেড়ে চ'লে এল মন্মথ। এল কলকাতায়। এখানেও ভাগ্য সহজে ফিরতে চায় নি। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অনেক দিন কেটেছে। না খেয়ে আধপেটা খেয়ে কেটেছে অনেক দুপুর। শীতের মধ্যে দূর সম্পর্কের কুটুম্ব-বাড়ির খোলা বারাণ্ডায় ছেঁড়া কম্বলের নিচে কাঁপতে হয়েছে অনেক রাত, তারপরে দিন ফিরেছে। এ্যাম্পুল ফ্যাক্টরীতে এখন সব চেয়ে ভালো কারিগর মন্মথ। পঁচিশ সি সি পঞ্চাশ সি সির ছোট এ্যাম্পুলে সে হাত দেয় না। দিন ভর খাটে রাত ভর খাটে আর সপ্তাহের শেষে পকেট ভরে আনে ছোট ছোট একটাকার নোট।

মা মাঝে মাঝে চিঠি দেয়, ভাইয়েদের চিঠি দুঃখ কষ্টের বর্ণনা

আর সাহায্যের আবেদনে ভরে ভরে ওঠে। উঠুক। এই রক্ত-জল-করা টাকায় আর কারো অধিকার নেই। এ শুধু তার আর তার স্ত্রীর। এর থেকে আর কাউকে কিছু তুলে দিতে গেলে আবার উপবাসের পালা সুরু হবে, লতার গায়ে উঠবে সেই ছেঁড়া আর ময়লা শাড়ি, হাতে নোয়া আর শাঁখা ছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তার চেয়ে দুজনে তারা বাঁচুক।

কিন্তু কাউকে সুখে থাকতে দেখলে কেবল আত্মীয়স্বজন নয়, পরন্তু যে পর আশেপাশের ভাড়াটেরা তাদেরও সহ্য হতে চায় না। ওদের হাব ভাব দেখে মন্মথ আর লতার এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না। কেবল নিন্দা, কেবল কুৎসা; আড়ালে আবডালে মন্মথ আর লতার কেবল বিরুদ্ধ সমালোচনা। তাদের লজ্জা নেই, চক্ষু-লজ্জা নেই, সভ্যতা ভব্যতা জ্ঞান নেই, মনের উদারতা নেই।

মন্মথ বলে, 'নেই তো নেই।'

লতা বলে, 'বয়ে গেছে।'

তারপর দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসে। সমস্ত পৃথিবী এক দিকে আর তারা একদিকে। ভাইয়েরাই বিরুদ্ধে লেগে কিছু ক'রে উঠতে পারল না আর এরা তো এরা।

সেদিন জলের কল নিয়ে সকলের সঙ্গে দারুণ এক চোট হয়ে গেল।

বাড়ি ভ'রে লোক গিজ-গিজ গিজ-গিজ করে। কল সহজে ছাড়া পাওয়া যায় না। যখন পাওয়া যায় তখন, হয় তো জল চ'লে গেছে। এমনি ক'রে গত দু'দিন ধরে লতা নাইতে পারেনি।

শুনে মন্মথ বলল, 'তুমি তো বোকা কম নও, খুব ভোরে উঠে চান ক'রে নেবে, আমার সঙ্গে সঙ্গে।'

সেই পরামর্শ ই ঠিক হোল। পরদিন অন্য কেউ উঠতে না উঠতে মন্মথ আর লতা দু'জনে গিয়ে দুটি কল দখল করে বসল। সাবান আর তোয়ালে নিয়ে মেয়েদের বাথরুমে ঢুকল লতা আর চৌবাচ্চার লাগা খোলা জায়গায় কলটার নিচে মাথা পেতে বসল মন্মথ। পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায় লতাও বেরোয়না, গামছা দিয়ে মন্মথের গা রগড়ানোও শেষ হয় না। দুই কলের কাছেই মিনিট কয়েকের মধ্যে ভিড় জমে গেল। মেয়েরা বাথরুমের দোরে এসে ধাক্কার পর ধাক্কা দিতে লাগল। কিন্তু লতার সাবান মাথার শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়া শব্দ নেই। একবার কাত্যায়নী আর একবার নিবারণবাবুর স্ত্রী নিভাননী মন্মথকে কলটা ছেড়ে দিতে বললেন, কিন্তু কথা যেন তার কানেই গেলনা, চান করছে তো চানই করছে।

এবার এলেন বিপিনবাবু আর নিবারণবাবু।

বিপিনবাবু বললেন, 'বেশ তো মজা পেয়েছ তোমরা। সকাল থেকে দুটো কল দুজনে আটকে রেখেছ, কেন আর কি মানুষ নেই বাড়িতে, না আর কেউ এখানে ভাড়া দিয়ে থাকে না?'

মন্মথ বলল, 'আমরা কি তাই বলেছি।'

নিবারণবাবু জবাব দিলেন, 'বলা কওয়া দিয়ে কি হবে, তোমাদের কার্যকলাপে তো তাই দেখছি। স্বামী-স্ত্রী বাপু এই বয়সে অনেক দেখলাম কিন্তু তোমাদের মত এমন গলায় গলায় সোহাগ আর

কোথাও দেখিনি। শুধু খাওয়া শোওয়াই নয়, চানটাও বুঝি দুজনের একসঙ্গে না হলে চলে না?'

বিপিনবাবু বললেন, 'না-ই যদি চলে, আলাদা একটা কলে আর দরকার কি, একেবারে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেই হয়। স্নানলীলাটা দিব্যি পছন্দ মত—'

মন্মথ বলল, 'তাতে আপত্তি ছিল না। তা আমরা পারতুম। কিন্তু আপনারাই তখন আবার বাড়িশুদ্ধ লোক বাথরুমের আশে পাশে গিয়ে উঁকি মারতেন। স্নানলীলাটা স্বচক্ষে না দেখে ছাড়তেন না।'

সহসা কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। কেবল বাথরুমের ভিতর থেকে ফিক ক'রে একটু হাসির শব্দ শোনা গেল।

বিভূতি এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এবার এগিয়ে এসে ধমকের সুরে বলল, 'বাপের বয়সী একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে অমন ইতরের মত কথা বলতে লজ্জা হয় না আপনার, ছি ছি ছি।'

মন্মথ তখন গামছা নিংড়ে মাথা মুছতে সুরু ক'রেছে, বলল, 'সবাইকেই চিনি মশাই। বাপের বয়সী খুড়োর বয়সী সবাইকেই চেনা আছে।'

একটু পরেই লতা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। মন্মথও তার পিছনে পিছনে গিয়ে ঘরে ঢুকল। বাইরে তখনও তর্জন গর্জন চলছে—মন্মথ যেন মনে না করে সবাইকে অপমান ক'রে, সকলের সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদ করে এ বাড়িতে সে থাকবে। আইন আদালত থানা পুলিস কিছুই করা তাদের দরকার হবে না। কেবল ঘাড় ধরে যে কোন সময় সদর দরজা দিয়ে শুধু বাড়ি থেকে বের করে দেবে।

মন্মথ কাপড় ছেড়ে বারান্দায় ছোট আয়না চিরুণী নিয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে জবাব দিল, 'তাই নাকি? আসুন না কে এসে ধরবেন আমার ঘাড়? আসুন না ঘাড় পেতে দাঁড়িয়ে আছি আমি।'

মন্মথের সুদৃঢ় ঘাড় আর বলিষ্ঠ মাংসপেশীগুলির দিকে তাকিয়ে সহসা কেউ এগুলো না। মুখে অনেকেই বলল, এর শোধ তারা তুলবেই। ঘরে ঢুকে মন্মথ মোলায়েম গলায় স্ত্রীকে বলল, 'তুমি ভয় পাওনি তো?'

বাইরের লোকের সঙ্গে কলহ বিবাদের পর মন্মথের এই মিষ্টি গলা লতার কানে আরো মধুর শোনায়। অমন ঝগড়ার গলা যদি মন্মথের না থাকত তাহলে তার কণ্ঠস্বরের এমন মাধুর্য যেন কিছুতেই তেমন করে ফুটে উঠতনা।

লতা স্বামীর সুদীর্ঘ সবল দেহের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি থাকতে আবার ভয় কিসের।'

কাজে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মন্মথ বলল, 'আর শোন। কাজটাজ সেরে সকাল সকালই তৈরী হয়ে থেক। সন্ধ্যার শোতে সিনেমায় যাওয়া যাবে দুজনে মিলে।'

লতা খুসী হয়ে বলল, 'টিকিট কেটেছ?'

'কেন বিনা টিকেটে ঢুকতে পারব না তোমাকে নিয়ে?'

ব'লে মন্মথ হেসে দুখানা সবুজ রঙের সিনেমার টিকিট স্ত্রীর হাতে তুলে দিল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'বেশ সেজে গুজে থাকা চাই কিন্তু. যাতে ওদের চোখ টাটায়।'

লতা মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা। অন্যের চোখ না টাটালে বুঝি নিজের ভালো লাগে না?'

মন্মথ বলল, 'তাতো লাগেইনা, সাজবে তো এমন করে সাজবে যাতে পরের চোখ টাটাবে আর বরের চোখ মুগ্ধ হবে।'

লতা বলল, 'সকাল সকাল ফিরো কিন্তু দেরি কোরোনা।'

বেলা পড়তে না পড়তে লতার সাজসজ্জা শুরু হয়ে গেল। চুল বাঁধল, আলতা পরল, ঠোঁটে লাগাল একটু আলতার ছোঁয়াচ, বাক্সের সবচেয়ে দামী গোলাপী রঙের শাড়িখানা পরল বের করে, বার বার ঘুরে ফিরে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে লাগল।

কিন্তু কখন এক সময় ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে এল। আয়নায় নিজের মুখ আব দেখা যায় না। ঘরে ইলেকট্রিক লাইট নেই। বিরক্ত হয়ে উঠে লতা হারিকেন জ্বালালো। কিন্তু সেই আলোয় গিয়ে নিজের মুখ দেখবার মত তার আর উৎসাহ রইল না।

এখনো কি ছ'টা বাজেনি? আর কখন ফিরবে মন্মথ? কখনই বা যাবে সিনেমায়? লতার কাছে কোনদিনই তো কথা খেলাপ করে না। কোনদিন চাল দেয় না, মিথ্যা কথা বলে না।

অভিমানে মন ভরে উঠল লতার। মন্মথের সঙ্গে আজ সে কথা বলবেনা, কিছুতেই না। এই তামাসার শোধ সে নেবে। কিন্তু কোন্ কৌশলটা ঠিক হবে। কথাই বন্ধ করবে লতা না হাজার কথায় মন্মথকে বিদ্ধ করে ছাড়বে। চোখা চোখা কথাগুলি লতা নিজের মনে গুছিয়ে রাখতে লাগল।

বিপিনবাবু আর বিভূতিবাবু কি সব আলাপ ক'রছেন, সহরের কোথায় নাকি কি হাঙ্গামা হয়েছে। অনেক লোক মরেছে, আহত হয়েছে আরো বেশী।

লতার খানিকটা কানে গেল খানিক গেলনা। মনে মনে মন্মথের সঙ্গে সে ধারাল কথার বিনিময় করছে।

রাত বেড়ে চলল মন্মথ তবু ফিরল না। রাত্রের রান্না লতা আগেই সেরে রেখেছে। অন্য দিন দু'জনের খাওয়া এর মধ্যে শেষ হয়ে যায়। আরম্ভ হয় গল্পগুজব। আজ এত দেরি করছে কেন মন্মথ?

রাত প্রায় দুপুরের সময় পাড়ার জন কয়েক ছাত্র আর মন্মথদের কারখানার কয়েকজন কারিগর মিলে নিয়ে এল মন্মথকে। পুলিসের গুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে।

উঠানের ওপর সযত্নে ওরা শুইয়ে রাখল মন্মথকে, চেহারার কোনই পরিবর্তন হয় নি। কনুইয়ের কাছে শার্টের হাতা দুটো ওলটানো, ইস্ত্রী করা কলার দুটো এখনো বেশ শক্ত ও শুভ্র। কেবল কোমরের নিচে তাজা রক্তের ছোপে জামাটা লাল হয়ে গিয়েছে।

লতার ঘরের সামনে বাড়ির সমস্ত লোক ভেঙে পড়ল—পাড়ার সমস্ত লোক এসে জড়ো হোল।

ছাত্রনেতা সুব্রত সকলের কাছে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে চলল, 'অসহায় ভীরুর মত মরেনি মন্মথ। মরেছে পুরুষের মত, বীরের মত। মরবার আগে একটা সার্জেন্টকে ঘায়েল করে গেছে। প্রথমে মন্মথ খানিকটা কৌতূহল নিয়েই ঢুকেছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল

দেখছিল ব্যাপারটা কি হচ্ছে। তারপর চোখের সামনে পুলিসের গুলিতে একজন তের চোদ্দ বছরের ছেলে যখন রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ল মন্মথের মনে কৌতুক বোধ আর রইল না। জনতার সঙ্গে মিশে সেও ইঁটের পর ইঁট ছুঁড়তে লাগল পুলিসের ওপর। অদ্ভুত তার হাতের তাক, কব্জির এমন জোর সাধারণত দেখা যায় না।'

নিবারণবাবু সগর্বে বল্লেন, 'কার মধ্যে যে কি আছে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তবে ছেলেটির মনের জোর যে অসাধারণ তার রোগ আর জেদের কাছে যে কেউ দাঁড়াতে পারে না তা আমি আগেই টের পেয়েছিলাম।'

বিপিনবাবু কিন্তু নিজের অক্ষমতা স্বীকার করলেন, বললেন, 'এ ছিল ছদ্মবেশী মহাপ্রাণ। আমরা আগে চিনতে পারিনি।'

মন্মথের শবদেহের চারপাশে বাড়ির সমস্ত মেয়ে পুরুষেরা এসে ঘিরে দাঁড়াল। তার দর্শনে পুণ্য স্পর্শে গৌরব। সে আজ স্বার্থপর, স্ত্রৈণ সাধারণ একজন এ্যাম্পুল ফ্যাক্টরীর কারিগর মাত্র নয়, সে বীর সে পুণ্যাত্মা। দেশের জন্য অবলীলায় সে প্রাণ দিয়েছে।

লতার কিছুই যেন বোধগম্য হচ্ছে না। সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনুভূতির ক্ষমতা সে যেন হারিয়ে ফেলেছে।

সুব্রত এগিয়ে গেল লতার সামনে। পিছনে পিছনে এগিয়ে এল আরো কয়েকজন ছাত্র।

সুব্রত বলল, 'কই আমার দিদি কই। এই যে, তোমার তো অমন করে থাকলে চলবে না দিদি। শোক দুঃখ তোমার জন্যে নয়। তোমার স্বামী তো কুকুর বিড়ালের মত মরেনি, সে প্রাণ দিয়েছে

দেশের জন্য। তার মৃত্যুর জন্য আমরা শোক করব না, অহংকার করব, প্রতিশোধ নেব তার মৃত্যুর।'

লতা অবাক বিস্ময়ে সুব্রতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কে এই ছেলেটি। কি বলতে চায় সে। এই দুর্বোধ্য শব্দগুলির মানে কি।

লতার কাছে মেয়েদের আসতে ইঙ্গিত করে সুব্রত অন্য কর্তব্যে মন দিল। বাড়ির ওপর উড়তে লাগল জাতীয় পতাকা। মন্মথকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এল খাট। ফুলের মালায় মন্মথের সমস্ত দেহ ঢাকা পড়বার জো হোল।

এবার শ্মশানের দিকে যাবে শোভাযাত্রা। উৎসাহী যুবকের দল এগিয়ে এল, খাট তুলবে কাঁধে। কাত্যায়নী নিভাননীরা আগলে ধরলেন লতাকে। শোকের আবেগে অস্থির হয়ে পাছে সাংঘাতিক কিছু করে বসে। এই সময়টাই ভারি মারাত্মক।

কিন্তু লতার ভাব দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। কোন উন্মত্ততা নেই, কোন চাঞ্চল্য নেই। শোকের কোন রকম উচ্ছ্বাস নেই চোখেমুখে। নিস্পন্দ কঠিন পাথরের মত তার মূর্তি।

খাট কাঁধে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আবার জয়ধ্বনি উঠল। শহীদ মন্মথের জয়।

কিন্তু অসহ্য আর্তনাদে লতা এবার লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কান্নার আবেগে সমস্ত শরীর তার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। জয়রথ চলেছে মন্মথের, কিন্তু তার পথ লতার হৃদয়ের ওপর দিয়ে।

পদক

খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে শান্তি নেই, এমন কি মনটা অশান্তিতে ভরা থাকলেও বাড়ীতে এতটুকু মেজাজ দেখাবার জো নেই কৈলাস কর্মকারের। চঞ্চলা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। গালিগালাজের দরকার হয় না, গলাটা একটু রুক্ষ হলেই মুখ তার ভার হয়ে যায়। তারপর নতুন একদফা শাড়ি গয়না ছাড়া কিছুতেই আর হাসি ফোটে না সে মুখে।

অথচ মন-মেজাজ খারাপ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে কৈলাসের। ব্যবসা-বাণিজ্যে কেবল মন্দাই নয়, কিছুকাল ধরে প্রায় বন্ধ হবার জো হয়েছে। বিক্রি-বন্ধকের রেওয়াজ যেন গাঁ থেকে উঠে গেছে হঠাৎ। মাসখানেক হতে চলল, এক রতি সোনা-রূপা আসেনি বাড়ীতে। ওপাড়ার যুধিষ্ঠির মণ্ডলের বউ সেদিন কাঁধ-বসা ছোট একটি পিতলের কলসী নিয়ে এসেছিল সন্ধ্যার সময়। এত পুরোণো যে, রঙ প্রায় কালো হয়ে গেছে। কিন্তু তার বদলেই তাকে দিতে হবে পাঁচ টাকা। কৈলাস তাকে গাল দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। 'তার চেয়ে পুকুর থেকে বরং এক কলসী জলই তুমি তুলে নিয়ে যাও, বউ! খেয়ে পেটও ভরবে, ঘরের জিনিসও থাকবে ঘরে।'

তবু মণ্ডলের বউ যা'হোক পুরোনো একটা কলসী নিয়ে এসেছিল, কিন্তু হরলাল ঢুলীর স্ত্রী নয়নের আক্কেলখানা দেখ। বেলা দুপুরের সময় একেবারে শুধু হাতে এসে হাজির।

'দশটা টাকা দাওনা নারাণের বাপ ধানের নৌকা এসেছে ঘাটে।'

হাত দু'খানা শূন্য। জীর্ণ আঁচলেও কোন রহস্য আর প্রচ্ছন্ন নেই। তবু কৈলাস সেদিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপ করল, 'একেবারে দশ টাকা! আচ্ছা কি এনেছ বার কর দেখি।'

নয়ন বলল, 'পোড়া কপাল আমার, বার করবার মত কিছু আর বাকি আছে নাকি নারাণের বাপ? একটা কুটোও আর নেই ঘরে। বন্ধক রাখতে চাওতো আমাকে রাখতে পারো।'

নয়ন রসিকতার ভঙ্গিতে মিষ্টি করে একটু হাসল।

আট দশ বছর আগে হলে মাত্র ওইটুকু হাসিতেই চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে পারত কৈলাসের। কিন্তু সে দিন নেই, সে বয়স নেই, সেই নয়নই কি আর নয়ন আছে! ছেলেমেয়ে মিলে গুটি সাতেক সন্তান হয়েছে নয়নের। আকালের বছরে তাদের চারটি মরেছে। নয়ন নিজেও মরতে বসেছিল। এই দু' তিন বছর পরেও নয়নের দেহ থেকে সেই মৃত্যুর চিহ্ন ভালো করে মিলায়নি। কিন্তু আর এক চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সে চিহ্ন সম্ভাবিত নতুন জীবনের। তবু মৃত্যুর চেয়েও যেন তা বীভৎস। বোধ হয় পুরো দশ মাসেরই পোয়াতী হবে নয়ন। ক্লান্ত দেহের দিকে তাকিয়ে কৈলাস ভাবল। তারপর নীরস রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল, 'না ভাই ঢুলী-বউ, তোমাকে বন্ধক রাখতে পারি অত ধনদৌলত আমার ঘরে নেই। তার চেয়ে—'

চুড়ির ঝঙ্কার শোনা গেল দোরের দিকে। কৈলাস চকিত হয়ে পিছন ফিরে তাকাল। আধো খোলা দরজার পাশে চঞ্চলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৈলাসকে থেমে যেতে দেখে চঞ্চলা ঠোঁট টিপে তীক্ষ্ণ একটু হাসল, 'বল না, কি বলছিলে! এত ভয় কিসের! ঘরে তোমার ধন-দৌলত না থাকে গায়ে গহনা তো আমার আছে। তাই দিয়েই না হয় ঢুলী-বউকে বাঁধা রাখো।'

কৈলাস বিব্রত হয়ে বলল, 'কি যে বল—'

নয়ন চেয়ে দেখল, কথাটা মিথ্যা বলেনি চঞ্চলা। ঘরের সমস্ত ধন-দৌলত উজাড় করেই বোধ হয় স্ত্রীর জন্য গয়না কিনেছে কৈলাস। সারা অঙ্গ সোনায় মুড়ে দিয়েছে। নাকে কানে হাতে গলায় কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। অতিকষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে রাখল নয়ন। কি একটা ব্যথায় বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ক্ষুধার জ্বালার চেয়েও সে যন্ত্রণা যেন বেশী দুঃসহ। এক রতি সোনাদানা কোন দিন গায়ে উঠেনি নয়নের। কিন্তু বাপের দেওয়া রূপার গয়না নিতান্ত কম ছিল না। পায়ে মল ছিল, মোটা মোটা দু'গাছা বালা ছিল হাতে, কানে ঝুমকো ছিল দু'গাছা, কিন্তু আজ কিছুই আর নেই। আকালের বছরে ঘটি-বাটি, মাঠের কাঠা কয়েক জমি, ঘরের ওপরকার করোগেট টিনের চাল পর্যন্ত বিক্রি করে খেতে হয়েছে। সেই সঙ্গে গেছে নয়নের মল, বালা, ঝুমকো। জেলে-পাড়ার বাতাসী, তুলসী, মেনকা কারো গায়েই কিছু ছিল না। কিন্তু এক আধখানা করে গয়না আবার দেখা দিয়েছে তাদের গায়ে। মেনকার স্বামী মুকুন্দ তো সোনার নাকফুল গড়িয়ে দিয়েছে বউকে। কি কপাল নিয়ে এসেছিল নয়ন, ঘরের পুরুষ গা থেকে গয়না কেবল খসিয়েই নিল, কোন দিন একখানা পরিয়ে দেখতে জানল না।

নয়নের পলকহীন চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে চঞ্চলা মুখ মুচকে আবার একটু হাসল, 'কি বল ঢুলী-বউ, দেব নাকি খসিয়ে? খুসি হবে তো তা'হলে? বাঁধা পড়বে? পছন্দ করবে, প্রাণভরে ভালোবাসবে আমার টাকপড়া, দাঁতনড়া সোয়ামীকে?'

কথা শেষ না হ'তে হ'তে হেসে যেন একেবারে গড়িয়ে পড়ল চঞ্চলা।

বিরক্ত হয়ে এবার ধমক দিয়ে উঠল কৈলাস, 'আঃ থাম দেখি, রঙ্গ-রস সব সময় ভালো লাগে না।'

নয়নের দিকে ফিরে এবার কৈলাস কাজের কথায় মন দিল, 'রঙ্গ-রস রাখো ঢুলী-বউ, কারবারপত্র বন্ধ, টাকা পয়সা আসবে কোথেকে! বাঁধা দেওয়ার মত কিছু যদি এনে থাকো দেখতে পারি চেষ্টা চরিত্র করে।'

নয়নের ক্লান্ত করুণ মুখখানা এবার কঠিন দেখাল: 'কিছু যদি থাকতই নারাণের বাপ, তোমাকে বার বার বলতে হত না। তোমার দোস্ত চাঁদেরকান্দী বিয়ে বাড়ীর বায়না রাখতে গেছে। এসেই তোমার টাকা ফেরৎ দিয়ে যাবে। টাকা মারা যাবে না, নারাণের বাপ। ধানের নৌকা ঘাট থেকে এখনই চলে যাচ্ছে, তাই এসেছিলাম।'

কৈলাস বলল, 'তাই বলে দেশ ছেড়ে তো আর চলে যাচ্ছে না। বায়না সেরে আসুক দোস্ত। সে-ই এসে ধান কিনবে গঞ্জ থেকে। মিছামিছি তুমিই বা অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ঢুলী-বউ?'

কৈলাশ যেন ভরসা আর আশ্বাস দিচ্ছে নয়নকে। ভঙ্গি দেখে

গা জ্বলে গেল নয়নের। অন্য সময় হলে বুড়ো মিনষের এই ঢঙ সে মোটেই নিঃশব্দে সহ্য করত না। কথার তুবড়ী ছুটিয়ে দিত কৈলাসের মুখের ওপর। কিন্তু আজ আর অনর্থক বাদ প্রতিবাদ করতে প্রবৃত্তি হল না নয়নের। দেহ আর বয় না। সামর্থে কুলায় না ঝগড়া করা। ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে নয়ন বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। কিন্তু পেছন থেকে ফের ডাকল কৈলাস, 'রাগ করলে নাকি চুলী-বউ?'

ভারি মমতা কৈলাসের কণ্ঠে। নয়ন রাগ করলে সত্যিই যেন প্রাণে খুব ব্যথা পাবে কৈলাস। দুঃখের আর শেষ থাকবে না। কথার জবাব দিতে ঘেন্না করে নয়নের, আবার জবাব না দিয়েও থাকা যায় না। জিহ্বাটি অস্থির হয়ে মুখের মধ্যে যেন আপনিই নড়ে নড়ে ওঠে। নয়ন মুখ ফিরিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'রাগ করব কেন? আমার কি আক্কেল নেই যে রাগ করব? আমি কি জানিনে, রাগ করলে মনে দুঃখ পাও তুমি?'

অনেক কাল আগে নয়নের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত কৈলাস। আড়ালে আবডালে, কখনো ভাষায়, কখনো আভাযে প্রণয় নিবেদনও করেছিল বার কয়েক। কিন্তু নয়ন রাজী হয়নি। কখনো হেসেছে, পরিহাস করে বলেছে, 'তোমার দোস্তর তাহলে উপায় হবে কি কর্মকার, নয়নহারা হয়ে সে বাঁচবে কি করে!'

কখনো দিয়েছে ধমক, কখনো ধক্ ধক্ করে কেবল আগুন জ্বলেছে তার চোখে, আজ সেই জ্বালা যেন দেহে মনে জড়িয়ে গেল কৈলাসের।

নয়নের চোখে সেই আগুন আর নেই, কিন্তু সাপের জিহ্বার মত বিষ আছে পরতে পরতে। রসনার রসে আর বিষে কোন ভেদ নেই।

অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করল কৈলাস। বলল, 'ঠিকই ধরেছ বউ, তুমি রাগ করলে দুঃখ এখনো পাই। কেবল রাগ, দুঃখ মিটাবার উপায় পাই নে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।'

'কর।'

কৈলাস বলল, 'তোমার হাত পা তো দেখছি একেবারে শঙ্খ, ঝড়ো কাটা। কিন্তু দোস্ত তো দিব্যি গয়না গলায় দিয়ে আজকালও মনের আনন্দে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

নয়নের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, 'তার মেডেলগুলির কথা বলছ?'

কৈলাস বলল, 'ওই হোল, মেডেলই বল আর গয়নাই বলো, একই কথা! পুরুষ মানুষ তো আর হার, নেকলেস, নাকছবি, কানপাশা পরে চলতে পাবে না, গয়নার সখ তারা ওই মেডেলেই মেটায়। আক্কেলখানা দেখ! তোমার গায়ে এক রতি সোনা-রূপা নেই আর নিজের—তুমিই বা কি রকম মানুষ ঢুলী-বউ, টাকা পয়সা না দিয়ে যায়, ওগুলিও তো চেয়ে রাখতে পার দোস্তের কাছ থেকে। কচি কচি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর। পয়সার সব সময় দরকার। কিন্তু খালি হাতে কি আজকাল কেউ কাউকে কিছু দেয়—না দিতে পারে ঢুলী-বউ! দেবে কোন্ ভরসায়, তবু ওই রূপার চাকতিগুলি যদি কাছে রাখো, সময়ে অসময়ে হাত পাতলে দু'চার টাকা অন্ততঃ মেলেই।'

নয়ন স্থিরদৃষ্টিতে একবার কৈলাসের দিকে তাকাল, তারপর আস্তে

আস্তে বলল, 'আচ্ছা এবার তো কিছু আর হোল না, এর পর থেকে তোমার পরামর্শ মতই চলব কর্মকার। চাকতিগুলি নিজের হাতেই রাখব, দরকার হলে সময়ে অসময়ে যাতে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি।'

কথা শেষ করে নয়ন এক ঝিলিক হাসল আর সে হাসি বিষাক্ত তীরের মত গিয়ে বিঁধল কৈলাসের বুকে।

কেবল কৈলাস কেন, কথাটা নয়নেরও অনেকদিন অনেকবার মনে হয়েছে, শুধু মনে হওয়াই নয়, এ নিয়ে কোন্দলও করেছে নয়ন স্বামীর সঙ্গে।

একটি দুইটি নয়, তিন কুড়ি মেডেল জোগাড় হয়েছিল হরলালের। কাছাকাছি দু'চার দশ গ্রামের মধ্যে এমন ঢুলী আর নেই, এমন পরিষ্কার হাত কারোরই নেই ঢোলে। কত জায়গায়, কত দেশে বিদেশে, বিয়েতে অন্নপ্রাশনে বড় বড় নামজাদা সব লোকের বাড়ীতে নামকরা বাদ্যকরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢোল বাজিয়েছে হরলাল। সব জায়গায় সে প্রশংসা পেয়েছে, যশ পেয়েছে আর সেই তরল গালানো যশ শক্ত হয়ে রূপ ধরেছে মেডেলের। কি তার জেল্লা, কি তার কারুকার্যের বাহার! কোন কোনটির মধ্যে নাম লেখা থাকত হরলালের। নিজের নাম ধাম হরলাল কোন রকমে লিখতে পড়তে পারে। কিন্তু নয়ন তো আর পারে না। সে কেবল চেয়ে দেখত আর আঙুল বুলাত স্বামীর নামের অক্ষরগুলির উপর। যেন সস্নেহে সাদরে স্বামীর গায়ে হাত বুলোচ্ছে।

কিন্তু রূপার মেডেল যত এল, রূপার টাকা তত এল না।

একেবারে যে এল না তা নয়, কিন্তু আসা না আসা সমান হয়ে গেল। হাতে পয়সা এলে একেবারে রাজার হালে থাকতে চাইত হরলাল। হাঁড়ি ভরে, খালুই ভরে দুধ মাছ আনত বাজার থেকে। নিজেরা খেত, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের খাইয়ে আমোদ ফূর্তি করত। তারপর বয়স যত বাড়তে লাগলো, জিহ্বা কেবল দুধ মাছের রসে তৃপ্ত রইল না হরলালের। গাঁয়ে থাকলে তাড়িই খেত, সহরে গঞ্জে গিয়ে খেত মদ। দেশ বিদেশ থেকে তখন কেবল মেডেল নয়, দু'এক বোতল মদও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে লাগল হরলাল।

নয়ন রাগ করে বলত, 'ওসব কি ছাইভস্ম আনছ হাতে করে ?'

টলতে টলতে আড়ষ্ট গলায় জবাব দিত হরলাল, 'ছাইভস্ম নয় রে পাগলী, ও সব হাতে না থাকলে ঢোলে ভাল করে হাত খোলে না। এ কেবল আমার কথা নয, বড় বড ওস্তাদ মহাজনের বাণী।'

মুখের কাছে মুখ নিয়ে রাত্রে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আনত নয়ন, 'ছি ছি, মুখে কি সব বিশ্রী গন্ধ তোমার !'

সোহাগ করে হরলাল সেই মুখ স্ত্রীর মুখের ওপর চেপে ধরত, 'কি যে বলিস, বিশ্রী কোথায়! এ হোল ওস্তাদের মুখের গন্ধ। যেতে দে কয়েক দিন, তারপর তোর নাকও ওস্তাদের নাক হবে।'

ক্রমে সে গন্ধ অবশ্য নয়নের নাকে একদিন সইল কিন্তু সংসার সইলনা। নয়নের খাড়ু বাজুর সঙ্গে মেডেলেও টান পড়ল হরলালের। তবু নয়নের গায়ে যখন একখানা গয়নাও রইল না, হরলালের গলায়, জমিদার বাড়ীতে উপহার-পাওয়া হরলালের বহুকালের জীর্ণ কোটের

বুক পকেটের ওপর দু'চারখানা মেডেল তখনো চিক চিক করতে লাগল।

নয়ন ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিল, 'কেমনতর ধরণ তোমার, আমার বাজু বন্দ সব গেল, তবু তোমার গয়না পরবার সখ গেল না!'

বুক পকেটের ওপর লটকানো চারদিকে সোনার কাজ করা সবচেয়ে দামী মেডেলটির দিকে সস্নেহে একবার তাকাল হরলাল, হেসে বলেছিল, 'তুই মিথ্যাই হিংসা করছিস নয়ানী! এ গয়না পুরুষ মানুষের কেবল সখের গয়না, সোহাগের গয়না নয়। সখ করে, সোহাগ করে গয়না পুরুষ মানুষ নিজেরা পরে না, মনের মানুষকে পরায়।'

নয়ন বলেছিল, 'আহাহা, কত গয়নাই পরেছে তোমার মনের মানুষ, সখের নয় তো কিসের গয়না তবে?'

হরলাল জবাব দিয়েছিল, 'সে কথা তুই ভালো করে বুঝবিনে নয়ন বউ, এ পুরুষ মানুষের মানের গয়না। এ গয়না গায়ে পরবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, যে মান একদিন পেয়েছিলাম, সে মান আমাকে আজও রাখতে হবে। হেলায় খেলায় চলবে না। এ গয়নার দিকে আর দশজনে লোভের চোখে, খারাপ চোখে তাকায় না, এ গয়না-পরা মানুষকে মানুষ ভয় ভক্তি করে, শ্রদ্ধা সমীহর চোখে দেখে।'

নয়ন সত্যিই বুঝতে পারেনি। কিন্তু তর্ক করতে ঝগড়া করতে সাহস হয়নি তার। বাবু ভুঁইয়াদের সঙ্গে মিশে মিশে হরলালও যেন তাঁদের মতই কথা বলতে শিখেছে। আর কিছু না বুঝলেও নয়ন এটুকু বুঝল, ওসব কথার জবাব তার মত লেখাপড়া না-জানা খাবচাষাদের মেয়েমানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, স্বামীর কথার জবাব দিতে

হলে তাকেও বাবু ভুঁইয়ার বউঝিদের মত লেখাপড়া শিখতে হবে। এসব কথার জবাব তো গেঁয়ো গালাগালির মধ্যে নেই, আছে বইয়ের ছাপার অক্ষরে। শুধু ঢোলেই ভালো হাত খোলে না হরলালের, সমস্ত ঢুলীপাড়ায় বইয়ের ছাপা অক্ষর পড়তে পারে, ছাপা অক্ষরের মত অক্ষর লিখতে পারে নিজের হাতে হরলালের মত এমন একজনও নেই। সারা গাঁয়েই বা কজন আছে! শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নয়ন। মুখ তো নয়, ছাপা অক্ষরের বই।

কিন্তু স্বামীর আজকের কাণ্ড দেখে নয়নের মনের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। চাঁদেরকান্দিব বিয়ে বাড়ির বাজনা বাজিয়ে দল বল নিয়ে ঢোল কাঁধে সন্ধ্যাসন্ধি ফিরে এল হরলাল। ছেলেমেয়েগুলি চার পাশ থেকে ঘিরে ধরল, 'কি এনেছ বাবা!'

নয়ন হাসিমুখে ঢোল নামিয়ে রাখল স্বামীর কাঁধ থেকে, কালো সুতার কারে বাঁধা মেডেলের মালাটা গলা থেকে খসিয়ে নিল। বুকের মধ্যে খচ করে উঠল মালা হাতে নিয়ে। আগেকার মত সেই অগুণতি মেডেল আর নেই, তিন চারটি মেডেলই ফাঁক ফাঁক করে ঝুলিয়ে মালা করা হয়েছে। আজকাল বড়লোকদের তো আর সেই কাল নেই, সেই দান নেই, ঢোলের বাজনা শুনে ওস্তাদের গলায় মেডেল ঝুলিয়ে দিতে জানে না তারা। কিন্তু ভাগ্যে যদি থাকে আবার হবে, আবার সব হবে নয়নের। মেডেলে মেডেলে হরলালের বুক ঢেকে যাবে আগের মত। মুখে হাসি এনে স্বামীর

বুক পকেটে আঁটা সেই সোনালী মেডেলখানাও আস্তে আস্তে খুলে সাদরে একবার হাতের মধ্যে মুঠ করে ধরল নয়ন। স্বামীর সমস্ত যশ, খ্যাতি, তার সমস্ত গুণপণা যেন নয়নের মুঠির ভিতরে স্পন্দিত হচ্ছে। বড় মেয়েকে ডেকে হুকুম দিল, 'হা, করে কি দেখছিস? যা, শিগগির হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক ভরে আন বাপের জন্য। কত দূর থেকে হয়রাণ হয়ে এসেছে মানুষ!'

তারপর সহাস্যে নয়ন মুখ ফিরাল স্বামীর দিকে, 'বাঁচিয়েছ। এবার মজা বুঝিয়ে দেব মুখপোড়া কর্মকারকে। ধানের নৌকো এখনো বাঁধা রয়েছে ঘাটে। দাও, টাকা দাও, সেই নৌকো থেকে ধানের বস্তা নিজের কাঁধে করে নিয়ে আসি। কর্মকারের বাড়ীর উপর দিয়ে আসব, তার চোখের সামনে দিয়ে আসব। ও চেয়ে চেয়ে দেখবে, ওর সোঁৎলাপড়া ময়লাধরা টাকা ছাড়াও আরো টাকা আছে মানুষের, সে টাকারও ধান বাখা যায়।'

কিন্তু আশ্চর্য মুখে হাসি নেই হরলালের, বিন্দুমাত্র শব্দ নেই মুখে।

নয়ন থমকে গিয়ে বলল, 'কি হোল?'

হরলাল আস্তে আস্তে বলল, 'টাকা নেই নয়ন, সব খরচ হয়ে গেছে।'

'খরচ হয়ে গেছে! মদ খেয়ে সব উড়িয়ে এসেছ বুঝি। আর আমার সোনার চাঁদেরা উপোস করে আছে দুদিন ধরে।' চেঁচিয়ে উঠল নয়ন। মনের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বেদনা তার মুখে ক্ষোভে আর আক্রোশে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

হরলাল বলল, 'তোর গায়ে হাত দিয়ে বলছি বউ, মদ নয়।'

দু'পা পিছিয়ে গেল নয়ন, 'খবরদার, ছুঁয়ো না আমাকে। মাতালের আবার গায়ে হাত দিয়ে দিব্য! মদ নয় তবে কি মেয়েমানুষ? গাটের কড়ি উজাড় করে দিয়ে এসেছ বুঝি তার পায়ে? চুলে পাক ধরতে চলল, তবু বদখেয়াল গেল না মনের?'

না, সে সব বদখেয়ালও নয়। স্ত্রীকে সবই খুলে বলল হরলাল। পথের মধ্যে বাবুইহাটির বাজারের ওপর দলের বংশীবাদক কানাইর কলেরা হয়েছিল। ডাক্তারের ভিজিট আর ওষুধের টাকা কানাই পাবে কোথা? বিয়েতে বাঁশী বাজিয়ে ভাগের ভাগ তার জুটেছে আড়াই টাকা। কিন্তু তাই বলে দলপতি হয়ে নিজের দলের মানুষকে তো আর সেই বাজারের দোচালা ঘরের মধ্যে হরলাল ফেলে আসতে পারে না! দেশ বিদেশের মানুষ বলবে কি?

বলবে কি! খানিকক্ষণ নয়নও একটি কথা বলতে পারল না। তারপর দুঃসহ ক্রোধে নয়ন যেন ক্ষেপে উঠল একেবারে। তার হাবভাব দেখে সভয়ে হরলাল একটু পিছিয়ে গেল। রাগ হলে নয়ন সব পারে। আঁচড়াতেও পারে, কামড়াতেও পারে।

'আর ঘরের মধ্যে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আমি যদি উপোস করে মরি তাহলেই বুঝি লোকে তোমাকে কাঁধে করে চৌদোলায় চড়িয়ে দেবে, না? তা' পোড়া দেশের মানুষ চড়াতেও পারে। যা তাদের আক্কেল বুদ্ধি, তাতে তাও পারে তারা। ঘরে একটাও দানা নেই আর তুমি এলে দানদাতব্য করে! এমন বুদ্ধি না হলে আর শুকিয়ে মরব কেন গুষ্ঠীশুদ্ধ, এমন কপাল না হলে—'

হরলাল বলতে গেল, 'কিন্তু তুই অমন করছিস কেন নয়ন ! এ টাকা তো কোনও খারাপ কাজে—'

নয়ন বলল, 'যে গুণধর পুরুষ তুমি। তোমার ভালো কাজও যা, খারাপ কাজও তা।'

তাছাড়া কি। বুকের ভিতরে হাহাকার করে উঠল নয়নের। মতি-গতি যখন খারাপ হয় তখন মদ, মেয়েমানুষে টাকা উড়ায় হরলাল আর বুদ্ধিটি ভালো থাকলে নাম-যশের জন্ত দানদাতব্য করে। তাব মদের নেশা যেমন, নামের নেশাও তেমনি। নয়নের কাছে কোন প্রভেদ নেই। হয় মদে, না হয় বারভূতে খায় হরলালের টাকা। আর হাড় কালি হয়ে যায় নয়নের ধামা-কুলো বুনতে বুনতে। বেশীর ভাগ সময় সেই ধামা-কুলো বিক্রির পয়সাতেই দুটো দানা জোটে নয়নের ছেলেমেয়েদের। হরলালের হাতে টাকা কবেই বা থাকে ! মুখে মদ, গলায় মেডেল নিয়ে সে তো দিব্যি দেশ ভরে নেচেকুঁদে বেড়ায়, তার দুঃখ কি !

চমকে উঠল যেন নয়ন। এই মুহূর্তে সেই মেডেলের রাশ হরলালের গলায় নেই, নয়নের হাতের মধ্যে জ্বলছে আর সেই জ্বালায় হাত পুড়ে যাচ্ছে নয়নের, বুক জ্বলে যাচ্ছে, মন পুড়ে যাচ্ছে খাক হয়ে। এই মেডেলের জন্ত অনেক জ্বলেছে নয়ন। আর নয়, আর নয়।

দুই হাতের মুঠোয় মেডেলগুলিকে শক্ত করে চেপে ধরল নয়ন, যেন কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, কেড়ে নিয়ে যাবে কেউ। তারপর কাঁটাল গাছটার তলা দিয়ে অন্ধকারে নয়ন পা বাড়াল।

হরলাল অবাক হয়ে বলল, ‘চললি কোথায় বউ ?’

পিছন ফিরে তাকাল নয়ন, তারপর নিতান্ত শান্তভাবে জবাব দিল, ‘কর্মকারবাড়ী।’

কি যেন একটু আপত্তি করতে গিয়ে হরলাল চুপ করে গেল, পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘আচ্ছা যা।’

কাঁটালতলা পেরিয়ে বিপিন ঢুলীর পোড়ো ভিটে। তার পরেই কৈলাসের বাড়ী। নতুন মুলি বাঁশের বেড়া ঘেরা দাওয়ায় বসে সন্ধ্যার পর কৈলাস মহাজনী কারবারের গোরাবাঁধা খাতা খুলে বসেছে। পাশে জ্বলছে চিমনি ফাটা হ্যারিকেনে লাল কেরোসিনের আলো। এক হাতে হুঁকো আর এক হাতে কলম নিয়ে স্থির হয়ে বসে রয়েছে কৈলাস। হুঁকোও চলছে না, কলমও নয়। হরলাল আর নয়নের দাম্পত্য কলহের প্রতিটি কথা শুনবার জন্য কলম আর হুঁকো তো দূরের কথা, হৃদপিণ্ডকেও যেন সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে রাখতে পারে কৈলাস। বয়সের সময় কতদিন ওদের ঘরের পিছনে গিয়ে আড়ি পেতেছে, বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে চেষ্টা করেছে ভিতরের কাণ্ড, কোন কোন দিন ধরা পড়েছে কিন্তু হার মানেনি কৈলাস। দোস্তের ঘরের পিছনে আড়ি পাতবে না পাতবে কোথায় ?

‘সে কথা ঠিক। কিন্তু আর বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে এসো। তামাক সাজ নয়ন,’ ব’লে হরলাল তাকে ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সে দিন নেই, সে কাল নেই। আজকাল আর আড়ি পাতবার দরকার হয় না। ওদের স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা আপনিই কানে আসে।

কেবল পারতপক্ষে হরলাল আর আসে না। দেখা হলে এখনো সেই ছেলেবেলার মত 'দোস্ত' বলে ডাকে, কৈলাসও 'দোস্ত' বলে সাড়া দেয়। কিন্তু মন সাড়া দেয় না, হৃদয় পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে থাকে। স্ত্রীর দিকে চোখ দেওয়া সত্ত্বেও সে চোখে হরলাল কোন দিন সড়কি বসিয়ে দেয়নি, কৈলাসও লাঠি মারেনি তার মাথায়। কেবল চোখেই দেখেছে, বন্ধুনীকে কোন দিন জোর ক'রে চেখে দেখতে চেষ্টা করেনি কৈলাস। তবুও চল্লিশ পেরিয়ে 'দোস্ত' কথাটি কেবল দু'জনের শুকনো মুখের ডাক হয়ে রয়েছে, অন্তরের রসসিন্ধু সে ডাকে আর উত্তাল হয়ে ওঠেনা। আবাল্যের বন্ধুত্বে নয়ন এসে যে বাধার সৃষ্টি করেছিল, সে বাধা, সে পরীক্ষা দুজনেই পার হয়ে গেছে, তবু বন্ধুত্ব টেকেনি। কৈলাসের মনে হয়েছে—হরলাল বোকা। হরলাল বলেছে, কৈলাস আগে ছিল কামার, এখন চামার হয়ে গেছে। তা হবে। চিরটা কাল একইভাবে হরলাল ঢোল বাজিয়ে আর তাড়ি টেনে কাটিয়ে দিল বলে কৈলাসও যে ঠুক ঠুক করে চিরদিন পরের বউঝির গয়না গড়বে, আর হাঁপর ফুঁয়োবে তার কি কথা আছে? বোকারা বুদ্ধিমানদের চামারই বলে থাকে। সে কথার মার আর যারই হোক, কৈলাসের কোন দিন গায়ে লাগে না। চামার না হলে পারত কৈলাস এমন বিত্তবিভব করতে? পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে অমন পনের বছরের সোনার প্রতিমাকে ঘরে এনে সোনায় মুড়ে রাখতে পারত? কামারগিরি না ছাড়লে দেশ বিদেশের বউঝিদের গয়না গড়িয়েই চুল-দাড়ি পেকে যেত কৈলাসের। হরলাল ঢুলীর স্ত্রী নয়নের মত তার বউয়ের গায়েও কোনদিন গয়না উঠত না,

বাড়ীতে উঠত না এমন আটচালা টিনের ঘর। ধানের সময়, পাটের সময় মাঠের শস্তে উঠান তা হলে ভরে উঠত না কৈলাসের।

'কে ?'

পা টিপে টিপে নয়ন একেবারে কৈলাসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে অদ্ভুত তার উল্লাস। জোরে আর জেদে যেন ফের আবার যৌবনের জোয়ার এসেছে দেহে।

সেই উল্লাসের জোয়ার কৈলাসের মনে এসে লাগল। নয়ন আবার এসেছে। আসতেই হবে। সেই দুপুরের নয়ন আর সন্ধ্যার নয়নে অনেক তফাৎ, অনেক পার্থক্য।

নয়ন ফিস ফিস করে বলল, 'শুনেছ তো সব ?'

সব যে শুনেছে, সে কথা কৈলাস গোপন করল না, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির আনন্দকে মুখের ছদ্ম বিষণ্ণতায় ঢাকবার চেষ্টা করে বলল, 'সবই কানে গেছে। তোমরা তো জাত-মান ঢেকে ছোট করে কেউ কথা বলো না। এত চেঁচামেচি পাড়ার কার কানেই বা না গেছে শুনি ?'

নয়ন বলল, 'তা যাক, কারো পরোয়া করি নাকি আমি ?' তারপর একটু চুপ করে থেকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে একবার হাসল নয়ন, "কেবল একজন ছাড়া। সে জন তুমি গো তুমি। তোমার কাছেই ফের এলাম কর্মকার। ধান আজ আমি কিনবই।'

কৈলাস তেমনি বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু তোমাকে তো আগেই বলেছি ঢুলীবউ, টাকা নেই আমার কাছে।'

'আছে আছে, এখন আছে।' বলতে বলতে আঁচল খুলতে

লাগল নয়ন। 'চন্দুলি কোথায়, আমার সতীন?'

কৈলাস অবাক হয়ে বলল, 'রাঁধছে রান্না ঘরে।'

মেডেলের মালাটি আঁচল থেকে খুলে ঝপ করে হঠাৎ কৈলাসের গলায় পরিয়ে দিল নয়ন, 'এবার, এবারও কি টাকা নেই তোমার কাছে?'

উৎসাহে আনন্দে চোখ দুটো চক চক করে উঠল কৈলাসের। গলার মেডেলের মালাটা খুলতে খুলতে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ছি ছি, এ কি করলে?'

কিন্তু মুখের কথা যে তার মনের কথা নয়, তা বলবার ভঙ্গিতে গোপন রইল না। নয়ন তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আর একটি করে মেডেল হাতের তেলোতেই ওজন করে দেখতে লাগল কৈলাস। না জিনিস খুব বেশী নেই। কেবল এই সোনার কাজ করা বড় গোল মেডেলটি ছাড়া। কিন্তু সেটিকে দু'একবার ঘুরিয়ে দেখেই কৈলাস চমকে উঠল। যেন বিদ্যুৎ ছুঁয়েছে হাত দিয়ে।

কৈলাস বলল, 'বাঃ রে, এ জিনিস এখনো আছে, এতো সেই আমার মেডেল!'

নয়ন অবাক হয়ে বলল, 'তোমার মানে?'

কৈলাসের চোখ যেন পলক ফেলতে চায় না, 'মানে আমারই হাতের। তেঁতুলকান্দির চৌধুরীদের মেজবাবুর বিয়েয় বড়বাবু এ জিনিস ফরমায়েস দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর দোস্তকে পরিয়ে দিয়েছিলেন এক উঠান লোকের মধ্যে।'

নয়ন কৈলাসের হাত থেকে আস্তে আস্তে তুলে নিল মেডেলটি। ফের নতুন করে দেখল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, 'সত্যিই ভারি চমৎকার, ভারি মিহি তোমার হাত ছিল কর্মকার!' তারপর একটু মৃদু হেসে চোখ তুলে বল্ল, 'ঠিক তোমার দোস্তের হাতের মত।'

লজ্জিত অপ্রতিভ ভঙ্গিতে নয়নের দিকে তাকিয়ে কৈলাস একটু হাসল। হরলালের প্রসঙ্গ ওঠায়, তার সঙ্গে তুলনা দেওয়ায় জ্বালা ধরল না মনে। বরং উপমার যাথার্থ, উপমার মাধুর্যের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে যেন সুদূর এক স্বপ্নাচ্ছন্নতার ভিতর থেকে কৈলাস জবাব দিল, 'বড়বাবুও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন নয়নবউ।'

নাম

স্ত্রী আর দুই বোনের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম। উঠতে বসতে তাগিদ, 'কই, ঝির কি করলে? বলে বলে যে আমরা হয়রান হয়ে গেলাম—'

খুঁজে খুঁজে আমিও কি কম হয়রান হয়েছি। কিন্তু কলকাতায় চার টাকার জায়গায় আট দশ টাকা মাসিক মাইনেয় যদি বা ঠিকে ঝি বারকয়েক ঠিক করা গেছে, গাঁয়ে এসে দেখতে পেলাম টাকা বিলিয়ে আর যাই মিলুক না কেন ঝি মিলবেনা।

আশে পাশে যে কয়েক ঘর কামার আর নমঃশূদ্র প্রতিবেশী আছে আগে তাদের বিধবা বোন আর মেয়েদের ভিতর থেকেই এ সব প্রয়োজন মিটত। কিন্তু আজ কাল দিনকাল বদলেছে। পুরুষদের মজুরীর রেট হয়েছে এখন দু'তিন টাকা। ফলে মেয়েদের মান সম্মানের দিকে চোখ পড়েছে। কি মেয়ে কি পুরুষ ঝি চাকর খাটতে আর কেউ রাজী নয়।

ঘুরে ঘুরে দু'তিন বাড়িতে গিয়ে ইসারা ইঙ্গিতে কথাটা পেড়েও ফেললাম। কিন্তু কেউ বলল, 'দেহ ভালো নয়, নিজের সংসারেই নানান ঝামেলা,' আবার কেউ বা পরিষ্কার মাথা নেড়ে জানাল, 'না কর্তা, সমাজে তা হলে কথা উঠবে।'

তা তো উঠবে, কিন্তু এদিকে বাইরের কাজকর্ম করার জন্য একজন মেয়েছেলে না হলে নিতান্তই যে আমাদের নয়।

সবচেয়ে অসুবিধা জলের। আধ মাইল খানেক দূরে নদী। ফাল্গুনেই জল হাঁটুর নীচে নামতে চায়। তাও রাত থাকতে থাকতে, খুব ভোর ভোর সময়ে গিয়ে পৌছলে সেটুকু দেখা যায়। একটু বেলা হয়ে গেলেই ঘোলা হ'তে হ'তে তরল কাদায় সেই জল রূপান্তরিত হয়। তিন ননদ বৌদিতে প্রথম দিন দুয়েক কলসী কাঁখে বেশ সোৎসাহে স্নান-যাত্রা সুরু করেছিল কিন্তু তৃতীয় দিনেই দেখা গেল তাদের মধ্যে দুজনের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। বলবার কিছু নেই। দীর্ঘকালের নাগরিক অভ্যাস বদলানো শক্ত। মনের জোর জিহ্বায় যত সহজে সঞ্চারিত হয় অন্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তত সহজে হয়ে ওঠে না।

জলের পর আগুন! রান্না করতে গিয়ে সুলতার প্রায় চোখ ছল ছল করে ওঠে আর কি। সহরের মত কয়লা এখানে মেলে না। শক্ত কোন রকম জ্বালানি কাঠেরও ব্যবস্থা করা যায়নি। উমা আর রমা দুজনে মিলে বাগান থেকে কিছু শুকনো পাতা আর ছিটকে ডাল সংগ্রহ করে এনেছে। আহার্য তৈরীর তাই একমাত্র ভরসা। আমি অবশ্য আশ্বাস পেয়েছি এবং আশ্বাস দিয়েছি যে শীগগিরই এর একটা সুব্যবস্থা হবে। নিষ্পত্র শুকনো শুকনো ডাল নিয়ে যে সব গাছ এখনো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারাই জ্বালানি রূপে সুলতার উনানের পাশে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে। কেবল জন দুয়েক কামলা মিললেই হয়।

পৈত্রিক বাড়িতে মাসখানেকের জন্য সপরিবারে বিশ্রাম এবং

চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে এসেছি। কিন্তু ঝি চাকরের আর কামলা কৃষাণের অভাব প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বকে দুঃসহ ক'রে তুলল।

পাশের গাঁ থেকে পিসেমশাই অবশেষে এনে হাজির করলেন ঝি। তাঁর প্রজা বুড়ো ভুবনমণ্ডলের বিধবা মেয়ে। আকালের বার ভুবন মারা যাওয়ায় তাঁর বাড়িতেই এতদিন ছিল। এবার তিনি তাকে নতুন চাকরিতে ভরতি ক'রে দিতে চান।

বললুম, 'আপনার চলবে কি ক'রে?'

পিসেমশাই বললেন, 'সেজন্য ভেবনা। তোমার পিসীমা একাই একশ'। কাজ কর্ম দেখে যদি পছন্দ হয় তুমি ওকে কলকাতায়ও নিয়ে যেতে পারো। শুনেছি সেখানেও ঝিরা নাকি সব রাজার ঝি হয়েছে।'

তামাক খেয়ে পিসেমশাই বিদায় নিলেন। আমি অন্দরে গেলাম ঝি সম্বন্ধে ওদের মতামত শুনতে। কিন্তু চাঁদ হাতে পাওয়ার মত মুখের ভাব কারোরই দেখলাম না। সুলতা আর উমা দুজনে গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছে। রমা হাসছে মুচকে মুচকে।

তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি, ঝি পছন্দ হয়েছে তো?'

সুলতা বলল, 'আচ্ছা পিসেমশাই না হয় বুড়ো মানুষ, তাঁর রুচির কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু তোমার কি সঙ্গে চোখ ছিল না?'

উমা বলল, 'রাগ কোরোনা দাদা, চোখ মানে এখানে চশমা।'

বললুম, 'দুই-ই ছিল বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের এ ধরণের সন্দেহের কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা।'

উমা বলল, 'দেখা যাক, আর একবার দেখে যদি পারো।' বলে উমা একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকল, 'ওগো, একবার এদিকে এসো ত, বাড়ির কর্তা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন।'

ঘরের পিছনে বসে জ্বালানির জন্য দা' দিয়ে শুকনো কঞ্চিগুলিকে ঝি ছোট ছোট করে কেটে রাখছিল। উমার ডাক শুনে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আট হাতি ধুতির আঁচলটুকু মাথায় টেনে দিতে বার দুয়েক চেষ্টা করল কিন্তু কোনবারই মাথায় আর তা রইল না।

সুলতা ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'চেহারাখানা দেখ একবার।'

এতক্ষণ চেহারাব কথা আমার মনেই হয় নি। ঝির আবার কেউ চেহারা দেখে নাকি। বিশেষত সারা গ্রাম খুঁজলে যা একটি মেলেনা, তার চেহারা কি রকম কে দেখতে যায়।

সুলতার অনুরোধে ওর দিকে এবার তাকিয়ে দেখলাম। বোঝা গেল এতক্ষণ কেন সুলতা আর উমার মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছিল, কেনই বা রমা হাসি চাপতে পারছিল না।

বছর তিরিশেক হবে বয়স। লম্বা ছিপছিপে একটি গাবের চারার মত চেহারা, কোন অঙ্গে যে বিশেষ রকমের খুঁৎ কিছু আছে তা নয় কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন রকম সামঞ্জস্যই যেন নেই। অত বড মুখে নাক এবং চোখ দুটিকে ভারী ছোট মনে হয়। দেহের তুলনায় হাত দুখানিও খুব খাটো এবং নীচের অংশ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত রকমের লম্বা। চেহারায় পুরুষালি ধরণটাই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। আসলে ও যেন মেয়ে নয়, মেয়ে সেজে এসেছে এবং সাজটা সম্পূর্ণ

করার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই। ঝির আঙ্গিক গঠনের এই বৈসাদৃশ্যই রমাকে হাসিয়েছে এবং সুলতাকে বিরক্ত ও গম্ভীর করে তুলেছে বুঝতে পারলাম! সুলতার ইচ্ছা বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাব যেন সুন্দর হয় এবং গৃহকর্ত্রীর সুরুচি এবং সৌন্দর্য-নিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়।

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি?'

কর্কশ পুরুষের কণ্ঠে জবাব এল, 'রসো।'

ওর পৌরুষের আধিক্যে স্ত্রীসুলভ লজ্জা অনুভব ক'রে একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললাম, 'কাজ কর্ম সব দেখে নিয়েছ? সব পারবে তো করতে?'

রসো বলল, 'কেন পারব না? এদেশের মানুষ না আমি, না বিলেত থেকে এসেছি?'

সুলতা বলল, 'তাতো আসোনি। কিন্তু মাথাটাকে অমন ন্যাড়া কদমছাঁটা করেছ কেন। চুলগুলি কি দোষ করল।'

রসো এবার লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল। বলল, 'আর বলবেন না বউঠাকরুণ। দিনরাত উকুনের জ্বালায় অস্থির হয়ে বেড়াতাম। মাথা ভরে কেবল চুলবুল চুলবুল করত। যত সব অশান্তির বাসা। শেষে রাগ করে দিলাম একদিন ছেঁটে।'

সুলতা রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'বেশ করেছ।'

ব্যক্তিগত ভাবে চুলের ভারি যত্ন করে সুলতা। তেল মাখিয়ে শুকানোয়, বেণী কি কবরী রচনায় অনেক সময় তার ব্যয় হয়।

কিন্তু তার প্রতিটি মুহূর্ত সে যেন আলাদা আলাদা করে উপভোগ করে। সুলতার জন্য সত্যিই কষ্ট বোধ করলাম।

সুলতা পিছিয়ে এল তো উমা গেল এগিয়ে। দ্বিতীয় দিনে আমার বিনা অনুমতিতেই সুটকেশ থেকে পুরোনো সরু নকসী-পেড়ে ধুতিখানা বের করে আনল। আলনা থেকে নামিয়ে নিল নিজের আধ-পুরোনো সাদা সেমিজটা। তারপর রসোর কাছে গিয়ে বলল, 'ওখানা ছেড়ে এগুলি পরো দেখি, ওভাবে তুমি ত দিব্যি স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা করো, এদিকে আমরা যে চোখ তুলে তাকাতে পারিনা। ছিঃ ছিঃ।'

রসো অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল। তারপর উমার দেওয়া সেই ধুতি আর সেমিজটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আড়ালে চলে গেল।

কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই দেখি সেই আট হাতি জীর্ণ ময়লা চীর পরে সে বেশ আরামে স্বচ্ছন্দে কাজ-কর্ম করছে।

উমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওমা, সেই ধুতি আর সেমিজ কি করলি?'

রসো অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'ছেড়ে রেখেছি। ভারি বাধো বাধো ঠেকে। আর পরতে না পরতেই যা ঘামাচি উঠেচে, দেখবেন?'

উমা বিকৃত মুখে বলল, 'থাক, তোমার ঘামাচি দেখে আমার আর দরকার নেই।'

আরো দিন কয়েক কাটল। দেখা গেল অবস্থার মোটামোটি উন্নতি হয়েছে। রসোর কদমছাঁটা মাথা, আঙ্গিক শ্রীহীন বৈসাদৃশ্য এবং পরিধেয়ের হ্রস্বতা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। কাজ

কর্মে সবাইকেই সে তুষ্ট করেছে। রান্না এবং খাওয়া ছাড়া প্রায় কোন কাজেই সুলতাদের হাত দিতে হয় না। কলসীতে কলসীতে নদী থেকে জল নিয়ে আসে রসো। এত জল যে তাতে সুলতাদের স্নান পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়।

জ্বালানি কাঠের কোন অভাব নেই আজকাল। শুকনো পাতা আর কঞ্চির খণ্ড নয়, অবসর মত বিকেলে বিকেলে ছোট কুড়ুলখানা নিয়ে আম আর গাবগাছের শুকনো গুঁড়িগুলি রসো চেলা করে দেয়। তার সে রূপ নাকি চোখ পেতে দেখা যায় না। মাথায় কোন কালেই রসোর কাপড় থাকে না। বুকের আঁচল মাজায় জড়িয়ে নেয়। তারপর লোহার মত শক্ত আবের গুঁড়ির ওপর মুহুর্মুহু তার কুড়ুল পড়তে থাকে; দর দর ক'রে ঘাম ঝরে পড়ে পিঠ বেয়ে।

সুলতা মাঝে মাঝে মিনতি করে বলে, 'থাকনা রসো, এসব পুরুষের কাজ তোমাকে করতে হবে না।'

কুড়ুল থামিয়ে রসো তার বিপুল মুখখানাকে বিকৃত করে জবাব দেয়, 'আহাহা কি সোহাগের কথাখানা গো। আমাকে করতে হবে না তো করবে কে শুনি? চাকর বাকর, কামলা কৃষাণ আছে দু'চার গণ্ডা, না দাদাবাবু নিজে এসে করতে পারবে। কোপ দেওয়া দূরে কুড়ুলখানা যদি ভালো করে ধরতে জানতো তবু না হয় বুঝতাম। গুণের ওই তো একখানা সোয়ামী। এরপর আবার পুরুষের কাজ আর মেয়েমানুষের কাজ বলে বকাবকি করছ বউঠাকরুণ।'

নায়ক নায়িকার সংলাপ রচনা করতে করতে হঠাৎ কথাগুলি

আমার কানে যায়। কিছুক্ষণের জন্য কলমটি স্তব্ধ হয়ে থাকে কিন্তু রসোব কুড়ুলের খট্ খট্ শব্দ চলতে থাকে অবিরাম। খানিক বাদে এসে রসো আবার আপোষ করে সুলতার সঙ্গে।

'সোসামীর নিন্দা কবলাম বলে রাগ করেছ নাকি বউঠাকরুণ?'

সুলতা হাসি গোপন কবে বলে, 'করেছিই তো। নিন্দা শুনলে রাগ হয না? তোব হোত না?'

জানলা দিয়ে চোখে পডল রসো তার বুড়ো আঙুল বাডিয়ে ধরেছে, 'হুঁ, এইটে হোত।'

উমা হঠাৎ ধমকের সুবে বলে, 'ছিঃ, ওসব কি?'

বসো পুবোনো প্রসঙ্গে ফিবে যায, 'কাজেব কথা বলছিলে বউ-ঠাকরুণ। কাজেব কি আবাব মেয়ে পুরুষ আছে। যে যা জানে তার সেই কাজ। তাই তাকে মানায়।'

বমা হেসে ওঠে, 'বাব্বাঃ, আমাদের বসবাজ যে আবাব বক্তৃতা দিতেও জানে দেখছি বউদি।"

রসোর পৌরুষকে স্বীকার কবে নিযে ওরা তার নাম রেখেছে বসরাজ। চাল চলনে রুচিতে প্রসাধনে নিজেদেব সঙ্গে রসোর মিল নেই। এ নিযে মনে আর কোন ক্ষোভ নেই সুলতার, চোখ আর পীড়িত হয়ে ওঠে না। ওব বেশে-বাসে, আচারে-ব্যবহারে লজ্জা পাওয়ার কি আছে। ওযে কেবল আমাদের নিজেদের শ্রেণীর মেয়ে নয় তাই নয়, ওব মধ্যে কোন শ্রেণীর কোন নারীত্বই নেই।

আরো একটি ঘটনায় এ কথার ভালো রকম প্রমাণ হয়ে গেল। আমাদের বাড়িব পাশের বাড়িতেই থাকেন কুঞ্জ কবিরাজ। ছেলেপুলে

নেই, বছর কয়েক আগে স্ত্রী মারা গেছে। আর একবার বিয়ের চেষ্টা করছিলেন কিন্তু মাথার চুল সব পেকে যাওয়ায় কোন মেয়ের বাপ রাজী হয়নি, পাড়ার ছেলেরাও শাসিয়েছে। অগত্যা বড়ি আর দাবার ব'ড়ে নিয়েই কবিরাজের দিন কাটে।

আমি বাড়ি এসেছি শুনে দাবার পুঁটলি হাতে রোজ আমাদের বাড়িতে তিনি আসা স্নুরু করলেন। বললাম, 'কিন্তু দাবা খেলা তো আমি জানিনে কবিরাজ মশাই।'

কবিরাজ মশাই নাছোড়বান্দা। বললেন, 'জানোনা, জানতে কতক্ষণ ?'

প্রথম দিন কয়েক খুব বিরক্ত বোধ করতাম। কিন্তু ক্রমশ একটু একটু ক'রে রস পেতে লাগলাম। নেশা জমে উঠল।

তবু কবিরাজেব মত জিততে পারি না, চালও দিতে পারি না তাড়াতাড়ি। ভাবতে হয়। অনেক সময় লাগে।

কবিরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন তারপর অধীর ভাবে বলেন, 'নাহে তুমি যে রাত ভোর করে দিতে চললে দেখছি। বসে বসে আমি কি করি বলোতো। অন্তত একটু ধোঁয়া টোয়ার ব্যবস্থা করলেও না হয় বুঝতুম।'

লজ্জিত হয়ে পরদিন থেকে কবিরাজ মশাইর জন্য তামাকের ব্যবস্থা করে দিলাম। হুকো কলকে এলো, মাটির ভাড়ে রইল মাখা তামাকের গুলি, আগুন-মালসায় দগদগ করতে লাগল চেলা কাঠের আগুন। নবাবী শিষ্টাচারে আরও এক ধাপ অগ্রসর হলাম। রসোকে ডেকে বললাম, 'রাত্রে তো কোন কাজ নেই। এখানে

কাছাকাছি থাকবি কবিরাজ মশাই যখন তামাক চাইবেন, ভরে দিবি তামাক।'

রসো হাত মুখ নেড়ে বলল, 'আহাহা কি সোহাগের কথা গো, ওঁরা রাত ভরে দাবা খেলবেন আর আমি বসে বসে কেবল তামাক ভরে দেব। আমার বুঝি আর মানুষের গতর নয়।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই রসো অত্যন্ত অপ্রতিভ এবং সংকুচিত হয়ে বলল, 'বকোনা দাদাবাবু, মুখে বললুম বলে, তোমার কথার কি সত্যিই অমান্য করতে পারি। তুমি হচ্ছ মনিব।'

সুবন্দোবস্তের ফলে কবিরাজ মশাইর তামাকের তৃষ্ণা ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। এক ছিলিম শেষ হ'তে না হ'তে আর এক ছিলিম রসোকে ভরতে বলেন। দুটো দিন যেতে না যেতে বড় বড় এক একটা গুলি কাবার হয়ে যায়। কিন্তু এ নিয়ে বলি বলি করেও কবিরাজ মশাইকে কিছু বলতে ভারি সংকোচ হয়। ভাবি, আর কটা দিনই বা।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এবং আকস্মিকভাবে যে দাবা আর তামাকের ওপর যবনিকা পড়বে ভাবতেই পারিনি। স্বর্ণতারা এ নিয়ে অনেকবার অনেক রকম মন্তব্য করেছে, কানে তুলিনি। কিন্তু সে রাত্রে ব্যাপার ঘটল একেবারে ভিন্ন রকম।

একটু বেশী রাত হয়ে যাওয়ায় এবং ওরা বারবার আপত্তি করতে থাকায় খেলা অসমাপ্ত রেখেই কবিরাজ মশাইকে বিদায় দিলাম। কবিরাজ মশাই নিতান্ত অনিচ্ছায় পুঁটুলি বেঁধে উঠে পড়লেন। বললেন, 'বড় বেরসিক লোক হে, একেবারে স্ত্রীর আঁচলধরা হয়ে পড়েছ।'

হেসে বললাম, 'সেটা তো রসিকেরই লক্ষণ। সে আঁচল যে রসে একেবারে ভিজে জবজবে হয়ে থাকে, তা কি এর মধ্যেই ভুলে গেলেন?'

রসো যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল লক্ষ্য করিনি। তার হাসির শব্দে চমকে উঠলাম। চমকালেন কবিরাজও। এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'রসো আলোটা একটু ধরোত্তো, ভারি অন্ধকার রাস্তা।'

বললাম, 'আমি দিচ্ছি এগিয়ে।'

রসো তাড়াতাড়ি হারিকেনটা তুলে নিয়ে বলল, 'না দাদাবাবু, আপনি থাকুন। পথ ঘাট ভালো নয়, আমিই যাচ্ছি।'

ঘরে গিয়ে সুলতার অভিযোগের জবাব দিতে চেষ্টা করছি হঠাৎ বাগানের ভিতর থেকে কবিরাজ মশাইর তীব্র আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলাম। ব্যাপার কি! সাপটাপ পড়ল নাকি রাস্তায়! তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। পিছন থেকে রমা আর উমা ভীত কণ্ঠে বলল, 'একটা আলো নিয়ে যাও দাদা। অমন অন্ধকারে যেয়োনা।'

খানিকটা যেতে না যেতেই বিস্মিত হয়ে দেখলাম, কবিরাজ মশাইর একখানা হাতের কবজী শক্ত করে ধরে রসো তাকে হিড়হিড় করে আমাদের বাড়ির দিকে টেনে আনছে।

বললাম, 'ব্যাপার কি রসো?'

রসো একটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে উঠল: 'হতচ্ছাড়া মুখপোড়া বুড়ো আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল বাগানের মধ্যে।'

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, 'ছেড়ে দাও ওঁকে। এসব কি কাণ্ড কবিরাজ মশাই ?'

কবিরাজ মশাইর চেহারাটা অত্যন্ত করুণ দেখাল। গরম চিমনির ছাপ লেগে গালের খানিকটা পুড়ে গেছে। হাত ছেড়ে দিতে মনে হলো কব্জীটা তাঁর মচকে গেছে। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম রসো সম্বন্ধে এমন ভুল, এমন মোহ, তাঁর হোল কি করে ? রসোর অন্তরে বাহিরে সত্যিই কী নারীত্ব বলে কিছু আছে ?

মহকুমা সহর থেকে টীকাদার এসেছে বসন্তের টীকা দেওয়ার জন্য। রোগটা প্রত্যেকবারই এই সময়টায় এ অঞ্চলে বেশ একটু ছড়িয়ে পড়ে। আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।

অন্য সব বাড়ি সেরে প্রায় দুপুরের সময় টীকাদার আমাদের বাড়িতে এল। মেয়েরা প্রথমটায় কিছুতেই টীকা নেবে না। টীকাদার বার বার অনুরোধ ক'রে বলতে লাগল, 'সবতো আমার মা লক্ষ্মী। আমার কাছে আবার লজ্জা কি আপনাদের।'

সুলতাদের বললাম, 'দোষ কি। নাওনা টীকা।'

বারাণ্ডায় চেয়ার পেতে টীকাদারকে বসতে দেওয়া হোল। পাড়ার কৌতূহলী ছেলেমেয়েরা টীকাদারের পিছনে পিছনে এসেছিল। ধমক খেয়ে আর তারা এগুলোনা।

শত হলেও বাইরের একজন লোকের সামনে বেরুতে হবে। আবাল্যের অভ্যাস মত তিনজনেই শাড়িটা বদলে নিল, আয়নায়

সামনে গিয়ে দেখে নিল মুখখানা। তারপর টীকা নেওয়ার জন্য বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল।

রসোও এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে দেখছে সব চেয়ে চেয়ে।

টীকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টীকাদারের সঙ্গের লোকটি একটি খাতায় নাম লিখে নিচ্ছে।

রমার টীকা দেওয়া হয়ে গেলে লোকটি বলল, 'ওর নামটা ?'

বললাম, "ডাকি তো রমা রমা ক'রে। ভালো নামটাই লিখুন, কাবেরী রায়।'

উমার পোষাকী নাম উজ্জয়িনী। স্মুলতার শুচিস্মিতা।

এবার রসোর পালা। টীকাদারের কাছে ঠিক মধুরেন সমাপয়েৎ হোলনা। রসোর শক্ত শাবলের মত হাতখানায় নিতান্ত নিস্পৃহভাবে সরু ছুরি দিয়ে গোটা তিনেক আঁচড় কেটে টীকাদার পরম অবহেলায় জিজ্ঞাসা করল, 'নাম ?'

বললাম, 'রসো।' রসো একবার আমার দিকে তাকাল, চোখ বুলিয়ে নিল স্মুলতাদের দিকে, তারপর টীকাদারের দিকে চেয়ে মোলায়েম গলায় বলল, 'না টীকাদার মশাই, আমার নাম রসমঞ্জরী।'

অবাক হয়ে রসোর দিকে তাকালাম। তার বেশবাসের সংস্কারের দিকে আজ আর কেউ লক্ষ্য করেনি। এতদিনে লক্ষ্য না করাটাই সকলের অভ্যাস হয়ে গেছে। রসোর পরনে সেই আট হাতি ময়লা ধুতি। কয়েক জায়গায় ছেঁড়া।

টীকাদাররা চলে গেলে বললাম, ‘আমরা তো জানতামনা। এ নাম তুই কোথায পেলিরে ?’

বসো ভারী লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করল। তারপব মৃদুস্বরে বলল, ‘পাবো আবার কোথায় ? পোড়ারমুখো কবরেজ সেদিন ওই নামেই ডেকেছিল।’

কুলপী বরফ

ষ্টেসন থেকে মিনিট দশেক হাঁটতে হয়। রাস্তার ছু' দিকে নারকেল আর সুপারির সার। ফাঁকে ফাঁকে একতলা কোঠা বাড়ী। মেটে বাড়ীর সংখ্যাই বেশী। এক জায়গায় ছোট্ট একটি বাঁশের ঝাড়।

যেতে যেতে নীরদ বলল, 'সহর ব'লে কিন্তু মনেই হয় না মনোহরদা।'

মনোহর বলল, 'সহর নাকি যে সহর বলে মনে হবে? কয়েকটা চটকল আর কাপড়ের কল আছে এই পর্যন্ত। অবশ্য স্কুল, পোষ্ট অফিস, বাজার সবই আছে। সেগুলি সব ওই দিকে'—বলে মনোহর হাত দিয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটা দেখিয়ে দিল।

নীরদ একটু হাসল, 'এটা বুঝি তাহলে তোমাদের সহরতলী?'

মনোহর তখনও সহরেরই বর্ণনা দিচ্ছে, 'গতবার ছুটো ব্যাঙ্ক এসেছে, এবার শুনেছি সিনেমাও হবে।' উজ্জ্বল, উৎফুল্ল ছুটি চোখে মনোহর নীরদের দিকে তাকাল।

শিয়ালদ' থেকে ট্রেণে মাত্র মিনিট পনেরর পথ। কিন্তু ভীড়ে আর গোলমালে গাড়ীতে যে ছুর্ভোগ নীরদকে ভোগ করতে হয়েছে পনের ঘণ্টাতেও যেন তার দাগ মুছবে না। একখানা গাড়ী ফেল করায় ষ্টেসনে এসে বসে থাকতে হয়েছে পুরো দেড় ঘণ্টা। ছুপুর গড়িয়ে গেছে; বার কয়েক চা টোষ্ট খেয়েও ক্ষিদের জলছে পেট।

সহরের ঐশ্বর্য-বর্ণনা নীরদের কানে খুব মধুর লাগল না, বলল, 'আর কতদূর তোমার বাসা ?'

মনোহর তাড়াতাড়ি বলল, 'এই তো, এই তো এসে গেছি। খুব কষ্ট হোল তোর, বেলা গেছে কোথায়, আমরা কিন্তু সেই সকাল থেকে আশায় আশায় আছি, এই আসে, এই আসে। একেকটা গাড়ীর শব্দ শুনি, আর দৌড়ে দৌড়ে আসি ষ্টেসনে, কিন্তু 'কাকস্য পরিবেদনা।' মানুষের দেখা নেই। শেষে তোর বউদি বললে…। —'এই যে নীরু, এই আমার কুঁড়ে।'

সদরের দরজায় খিল দেওয়া ছিল না। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতরে অত্যন্ত ছোট মেটে একখানা ঘর, ওপরে গোলপাতার ছাউনি। পাশেই আর একটু দোচালার মধ্যে পাকের জায়গা। কুঁড়েই বটে। কিন্তু মনোহরের কথার ভঙ্গিতে মনে হোল বড একটা প্রাসাদকে নিতান্ত বিনয় আর সৌজন্যেই সে কুঁড়ে আখ্যা দিয়েছে। কুঁড়ে যেন এটা আসলে নয়।

ভিতরে ঢুকেই মহা ব্যস্ত হয়ে উঠল মনোহর। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কথাবার্তা আলাপ সালাপ পরে হবে। আগে খেতে দাও ওকে। দেখ, মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে, বেলা আর আছে নাকি!'

নীরদরা আসবার সঙ্গে সঙ্গে নির্মলা আধ হাত ঘোমটা টেনে দিয়েছে। আলাপ করবার কোন গরজই তার মধ্যে দেখা গেল না। উনানের উপর কি একটা তরকারি হচ্ছিল। সেটা নামিয়ে নিয়ে সে এল শোয়ার ঘরে। দ্রুতহাতে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে নিল

জায়গা, দুখানা আসন পাশাপাশি পেতে ঠাঁই করে দিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'বসতে বল ঠাকুরপোকে।'

মনোহর একটু রসিকতা করল, 'বাঃ, কেবল আমি বললেই হবে নাকি? তোমার মুখের কথা না শুনলে—'

ঘোমটার ভিতর থেকে অনুচ্চ ধমক শোনা গেল, 'আঃ, রঙ্গ রাখো। আমার কথা ওঁর পরে শুনলেও চলবে। খেয়ে দেয়ে আগে সুস্থ হয়ে নিন।'

নীরদ আসনে বসতে বসতে বলল, 'থাক মনোহরদা, খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছ খেয়েই যাই, মুখ দেখা আর কথা শোনার নিমন্ত্রণ আর একদিন কোরো, সেদিন এসে দেখে শুনে যাব।'

এবার ঘোমটার ভিতর থেকে চাপা হাসির শব্দ উঠল।

আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। দু রকমের ডাল, তিন রকমের নিরামিষ তরকারী, মাছ তিনচারটা, টক, দই, মিষ্টান্ন, বাদ নেই কিছুই।

মনোহর খেতে খেতে বলল, 'কেমন হয়েছে রান্না। তুই যে কিছুই প্রায় খাচ্ছিসনে।'

নীরদ জবাব দিল, 'আমাকে কি মহাপেটুক ঠিক করেছ। চেহারা দেখে তাই মনে হয় নাকি? আর এত সব আয়োজনই বা কেন। আমি কি অতিথ না কুটুম্ব?'

মনোহর মৃদু হেসে বলল, 'আয়োজন আর করতে পারলাম কই। কিন্তু অতিথ-কুটুম্বের চেয়েও তুই বাড়া হয়ে গেছিস। সেদিন দেখে তো চিনতেই পারলিনে।'

নীরদ লজ্জিত হয়ে বলল, 'সাত আট বছর পরে দেখা। তারপর

অত বড় বড় গোঁপ গজিয়েছে ঠোঁটের ওপর। কি করে হঠাৎ চিনে ফেলি বল। গল্পটা আপনার কাছে বলছি বউদি। আপনি নিশ্চয়ই এর আগে শুনেছেন। কিন্তু এবার শুনতে হয়তো একটু অন্য রকম লাগবে। এক বন্ধুকে তুলে দিতে এসেছি ষ্টেসনে। আসন্ন বিচ্ছেদে মন অন্যমনস্ক। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই কে একটি লোক এসে আচমকা আমার কব্জী চেপে ধরল। নাড়া লেগে সদ্য-ধরানো সিগারেটটা গেল পড়ে। চোখ গরম করে বললাম, 'কে আপনি।' লোকটি মুচকি হেসে বলল, 'দেখুন মনে করে।' মনে ক'রে দেখবার আগে আমি চেহারাটা আর একবার চেয়ে দেখলাম। বেঁটে ছোটখাটো মজবুত শরীর। বর্ণ ঘনশ্যাম। গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, বাঁ হাতে মস্ত বড় এক ঝুলি। তার ভারে ভদ্রলোক ঈষৎ কাৎ হয়ে পড়েছেন। —ভালো কথা মনোহরদা, সেদিন জিজ্ঞেস করা হয় নি। অত বড় ঝুলির মধ্যে কি বাজার করে নিয়ে ফিরছিলে? কি ছিল তার মধ্যে?'

এতক্ষণ নির্মলা হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়ছিল, মনোহর নিজেও উপভোগ করছিল নীরদের সেদিনকার বর্ণনা। কিন্তু ঝুলির কথা তুলতেই নির্মলার হাসি বন্ধ হোল, ম্লান হয়ে গেল মনোহরের মুখ।

মনোহর একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'ও কিছু নয়।'

নীরদ প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'কিছু নয় বললেই আমি বিশ্বাস করলাম আর কি। আচ্ছা বউদি আপনিই বলুন না দাদাকে সেদিন এত কি আনতে পাঠিয়েছিলেন বাজারে।'

কিন্তু নির্মলা মুখ নিচু করেই রইল। নীরদের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

মনোহর খানিকক্ষণ গম্ভীরমুখে নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'কি দরকার এত ঢাকঢাক গুড়গুড়ের। থলের মধ্যে আর কি থাকবে। ছিল বরফ।'

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'বরফ! অত বরফ দিয়ে করলে কি। অসুখ বিসুখ ছিল নাকি বাড়িতে?'

নির্মলা আর বসল না। খালি ভাতের থালা হাতে রান্নাঘরের দিকে চলল।

মনোহর সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'ঈস লজ্জার বহর দেখ। যাতে ভাত জুটছে, কাপড় জুটছে, তার নাম করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে পড়ে, অপমান বোধ হয়!'

নীরদ বলল, 'ব্যাপার কি মনোহরদা।'

মনোহর বলল, 'না. ব্যাপার এমন কিছু নয়। আচ্ছা ভায়া, এম এ, বি এ, পাশ করেছ, চাকরি বাকরিও করছ কিন্তু গাড়ী বাড়ী কোথায় কি করতে পেরেছ শুনি।'

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'হঠাৎ এ কথা কেন মনোহরদা?'

মনোহর বলল, 'শুনিই না, করেছ নাকি কোথাও কিছু।'

নীরদ বলল, 'ক্ষেপেছ, যা দিনকাল তাতে নিজের খরচটা কোনরকমে চালিয়ে থাকতে পারলেই ঢের।'

মনোহর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, 'ঐ শোন।' তারপর নীরদের দিকে আবার ফিরে তাকাল মনোহর, 'কিন্তু ভায়া বরফই বেচি, আর যাই

করি, এই যা দেখছ, তোমার মা-বাপের আশীর্বাদে সব নিজের। মাসে মাসে ভাড়া গুণতে হয় না, কথার তলে থাকতে হয় না কারো।' আত্মপ্রসাদে মনোহরের চোখ দুটি উজ্জ্বল দেখাল!

নির্মলা নিঃশব্দে পরিবেশন করে যেতে লাগল।

নিজেদের সামান্য বাড়ীঘর নিয়ে স্বামীর এই আকস্মিক দম্ভে নির্মলার লজ্জার যেন আর সীমা রইল না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি ভাবলেন ঠাকুরপো। 'এই দু তিন দিন ধ'রে স্বামীস্ত্রীতে মিলে ঠিক করেছিল নিজেদের ব্যবসার কথা এই উচ্চশিক্ষিত, চাকুরে, দূর-সম্পর্কের আত্মীয়টির কাছ থেকে তারা গোপন রাখবে। কতক্ষণই বা থাকবে নীরদ। যে গাড়ীতে আসবে তার পরের গাড়ীতেই চ'লে যাবে। কি দরকার তাকে নিজেদের জীবিকার কথা জানানো। প্রসঙ্গক্রমে কথাটা যদি ওঠেই মনোহর না হয় বলবে এখানেই কোন অফিস-টপিসে কাজ করে। মনোহরকে আজ তাই বরফ ফিরি করতে বের হতে দেয়নি নির্মলা। নিজেও বরফ রাখবার হাঁড়ি, দুধ জ্বাল দেওয়ার বড় কড়াই, ছোট ছোট কুড়ি কয়েক টিনের চোঙা এবং অন্য সব ছোট বড় সরঞ্জাম লুকিয়ে রেখেছে এখানে ওখানে, রান্নাঘরের কোণে তক্তপোষের তলায়। কিন্তু মনোহর মেজাজ খারাপ করে হঠাৎ যে সমস্ত কথা এমন ভাবে ফাঁস করে দেবে তা নির্মলা আশঙ্কা করেনি। তবু একটা কথা ভেবে সে মনে মনে একটু স্বস্তি বোধ করল। ভদ্রলোকের অযোগ্য এই জীবিকার জন্য যে তাকেও সাহায্য করতে হয়, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কেবল এই নিয়েই যে তার কাটে, মনোহরের হাস্যকর দম্ভের মধ্যে একথাটা প্রকাশ হয়নি।

এখন পর্যন্ত বাপের বাড়ীব তরফের দূর সম্পর্কের আত্মীয়েরা এ সব কথা জানে না। তাদেব কাছ থেকে এ তথ্যটা নির্মলা অনেক কষ্টে অনেক কৌশলে গোপন রেখেছে। বাবা বেঁচে থাকলে এমন সম্বন্ধ তার হোত না। দেনায় ডুবু ডুবু দাদা তাকে যে পাত্রস্থ করতে পেরেছে এই তো যথেষ্ট। তার বর কি করে না করে এটা আর কে যাচাই করে দেখতে আসে। নির্মলা ভেবেছিল ঠিক ঐ রকম কৌশলে নীরদকেও কিছু জানতে দেবে না। নীরদ জেনে থাক মনোহরও ভদ্ররকমের চাকবি বাকরি করে, ভালো খায়, ভালো পরে, কারো চেয়ে সে হীন নয়। কিন্তু নিজের ধৈর্যহীন অসহিষ্ণু স্বভাবের জন্য এমন কাণ্ড মনোহব করে বসল যে নির্মলার আর মুখ দেখাবার জো রইল না।

ব্যাপারটা এবার নীরদও কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারল। মনে পড়ল অনেককাল আগে মনোহরের বরফের কারবারের কথা কার কাছে সে যেন শুনেছিল। কিন্তু কথাটা মোটেই তার মনে ছিল না। তার নিরর্থক মেয়েলি কৌতূহলের জন্যই যে এমন একটি অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হোল সে কথা ভেবে নীরদ অপ্রতিভ এমন কি খানিকটা অনুতপ্তই হয়ে পড়ল।

দাওয়ায় পাটি বিছিয়ে বালিশ পেতে এরই মধ্যে পরিপাটি বিশ্রামের আয়োজন ক'রে রাখা হয়েছে। পিতলের ছোট রেকাবিতে এসেছে পান, মশলা। নীরদ একটু সুপারি তুলে নিয়ে বলল, 'যে রকম ব্যবস্থা দেখছি তাতে যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু এমন একটা জরুরি কাজ আছে আড়াইটের সময়—'

মনোহর বলল 'রবিবার আবার জরুরী কাজ কিসের। তা ছাড়া গাড়িও তো নেই এখন।'

দোরের আড়াল থেকে নির্মলা বলল, 'খেয়ে উঠেই যদি ছোটেন লোকে ভাববে দাদার বাড়ীতে কেবল নিমন্ত্রণ খেতে এসেছিলেন।'

নীরদ বলল, 'কিন্তু নিমন্ত্রণ খাওয়া ছাড়া আর কি কোন রকম আশা আছে? এতক্ষণ তবু ঘোমটার আড়ালে ছিলেন, এবার গেলেন দোরের আড়ালে। সামনে যে আসবেন এমন কোন লক্ষণই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

মনোহর বলল, 'হবে হে ভায়া, সময়ে সব হবে। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে আসতে দাও।'

নীরদ বলল, 'সত্যি, আজ ভারি দেরী হয়ে গেল ওঁর খেতে।'

মনোহর বলল, 'এ আর নতুন কি। এমন দেরী ওর রোজই হয়।'

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'রোজ! কেন?'

মনোহর বলল, 'কেন আবার, বেলা একটা দেড়টা তো বরফের ক্ষীর জাল দিতেই কাটে। কুলির মাথায় হাঁড়ি চাপিয়ে আমি বেরোই তবে তোমার বউদি গিয়ে খেতে বসে।'

নীরদ কৌতূহল-কণ্ঠে বলল, 'ও, উনিই বুঝি নিজ হাতে সব করেন?'

'আর কে করবে তবে? এর জন্য কি লোক ভাড়া ক'রে আনব নাকি বাইরে থেকে?'

নির্মলা আর দাঁড়াল না। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু খেতে বসতে তার ইচ্ছা করছে না।

মনোহর খুঁটিনাটি নীরদকে সব না জানিয়ে ছাড়বে না। কিন্তু এসব কথা কি এমনই গৌরবের যে সবাইকে তা বলে বেড়ান যায়।

সিগারেট আনতে মনোহর গেল বাইরে। দোকান কাছাকাছি নেই। খানিকটা দূরেই যেতে হবে। নীরদ বলল, 'থাক না,' কিন্তু মনোহর সে কথা কানে তুলল না।

একটু পরেই রান্নাঘরের কাজ সেরে নির্মলা এসে উপস্থিত হোল। বরফের ব্যবসার কথা তার কাছে সব প্রকাশ ক'রে দেওয়া যে নির্মলার ইচ্ছা ছিল না তা নীরদের বুঝতে বাকি নেই, তবু একটু ইতস্তত করে নীরদ বলল, 'ভিতরে ভিতরে যে এত গুণ আছে আপনার সে সব আমার কাছে গোপন করে যাবেন ভেবেছিলেন, না?'

নির্মলা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'গুণ! গুণ আবার কোথায় দেখলেন আমার!'

নীরদ বলল, 'গুণ নয় তো কি! এমন কুলপী বরফ না কি এ অঞ্চলে আর কেউ তৈরী করতে পারে না। আর এত বড় কথাই আপনি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছিলেন। কিন্তু আজ আপনার হাতের কুলপী বরফ না খেয়ে আমি এক পাও নড়ছি না। হাজার জরুরী কাজ থাকলেও না। বাইরের এত আজে বাজে লোককে খাওয়াতে পারেন আর যত দোষ করলাম বুঝি আমি!'

নির্মলা মৃদুস্বরে বলল, 'কিন্তু আজ তো হবে না।'

'বেশ, কবে হবে বলুন। সেদিনই আমি আসব।'

নির্মলা বলল, 'যেদিন আপনার সুবিধা। তৈরী তো রোজই আমাকে করতে হয়।'

নীরদ বলল, 'কিন্তু রোজ তো অফিস আমাকে ছুটি দেবে না। মনোহরদাও নিমন্ত্রণ করবেন না। আমি আসব সামনের রবিবার। যেচে নিজেই নিমন্ত্রণ নিয়ে গেলাম, মনে থাকে যেন। সেদিন যেন বঞ্চিত না হই।'

কুলপী বরফ রোজ তৈরী করলেও রবিবার একটু বিশেষ আয়োজন করল নির্মলা। অন্য দিনের আটপৌরে বেশটা বদলালো। কড়াই আর ছোট ছোট চোঙাগুলিকে ঝকঝকে করল মেজে। যেখানে বসে তৈরী করে জিনিস, নিকিয়ে পুছে পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখল সে জায়গাটা।

নীরদ আজ অনেক সকাল সকাল এসে পৌছল। বাজার ক'রে নিয়ে এসেছে বৈঠকখানা থেকে। মাছ, তরকারি, এক ঝুড়ি আম, কুলির হাত থেকে নিজেই সব নামিয়ে রাখতে লাগল দাওয়ায়।

মনোহর বলল, 'এসব কি।'

নীরদ বলল, 'জিজ্ঞেস কর বউদিকে। আজকের নিমন্ত্রণ তিনি করেন নি, করেছি আমি। তিনি শুধু খাওয়াবেন কুলপী বরফ।'

সিগারেট টানতে টানতে নীরদ ছোট্ট উঠানটুকুতে পায়চারি করে আর রান্নাঘরের সামনে এসে একেকবার থামে আর চেয়ে চেয়ে দেখে নির্মলার কুলপী বরফ তৈরীর আয়োজন।

নীরদের এই কৌতূহল মনোহরের কাছেও উপভোগ্য হয়ে উঠল। নিজের ঔৎসুক্যে, আগ্রহে, নীরদ যেন তাদের ব্যবসাকে নতুন মূল্য দিয়েছে, গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে তার আর নির্মলার।

মনোহর বলল, 'নীরদকে একটি বসবার আসন টাসন দাও না এখানে। রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে তোমার কাছ থেকে বিদ্যাটিও শিখে নিতে চায়। সে তো আর অমন ঘুরে ঘুরে হবে না, মন স্থির ক'রে এক জায়গায় বসে শিখতে হবে।'

নির্মলা তাড়াতাড়ি উঠে গেল। ঘর থেকে বার ক'রে আনল ছোট একখানা জলচৌকি। তার ওপর পেতে দিল চারিদিকে লতা-ঘেরা নিজ হাতে বোনা কার্পেটের আসন। আসনটি তার কুমারী বয়সের তৈরী। স্বামীর ঘরে আসবার সময় নিয়ে এসেছে সঙ্গে।

মনোহর ঠাট্টা ক'রে বলল, 'ঈস, নীরদ যে একেবারে দেখতে দেখতে গুরুদেব হয়ে উঠলি দেখছি।'

নীরদ সেই আসন-ঢাকা জলচৌকির ওপর বসতে বসতে বলল, 'উল্টো কথা বললে যে মনোহরদা। এখন থেকে গুরু তো হোলেন ইনিই। বিদ্যেটা এঁর কাছ থেকেই তো শিখে নিতে হবে।'

নির্মলার সেই ঘোমটার দৈর্ঘ আর নেই। খাটো ঘোমটার ফাঁকে চাপা হাসিতে উজ্জ্বল মুখখানি ভারি সুন্দর লাগল নীরদের। এমন ঘরে এমন মুখ সত্যিই অপ্রত্যাশিত।

কথা বলল কিন্তু নির্মলা স্বামীকে উদ্দেশ করেই। বলল, 'তুমিও যেমন, ঠাকুরপো ভেবেছেন আমরা এমনি বোকা যে ওঁর ঠাট্টাটাও বুঝতে পারিনে। এ বিদ্যে শিখবেন উনি কোন দুঃখে।'

জিনিস প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে। মনোহর বেরুবার জন্য প্রস্তুত হ'তে গেল। একটা কুলি ঠিক করাই আছে। হাঁড়িগুলি মাথায়

ক'রে সেই বয়ে নিয়ে যাবে। তারপর দিয়ে আসবে ষ্টেসনের কাছে নির্দিষ্ট সেই আমগাছটির তলায়। জলচৌকির ওপর বসে বসে সেখানেই বরফ বিক্রি করবে মনোহর। বছর কয়েক হোল এইটুকু আভিজাত্য তার হয়েছে। নিজের মাথায় বয়ে নেয়না হাঁড়ি, ফিরি করেনা সহর ভরে। তার বরফের খাবারের ঔৎকর্ষ সহর ভরে লোক জানে। তারা আজকাল নিজেরাই আসে তার কাছে।

মনোহর একটু অন্তরালে গেলে নীরদ বলল, 'বিদ্যাটি শিখতে যত দুঃখ কষ্টই হোক তাতে আমি রাজী আছি। কিন্তু আপনার বোধ হয় শেখাবার দিকে মন নেই!'

নির্মলা ঠোট টিপে একটু হাসল, 'আপনাকে শিখিয়ে হবে কি। তার চেয়ে বউ নিয়ে আসুন বিয়ে ক'রে, তাকে দেব শিখিয়ে। বাড়িতে আপনাকে মাঝে মাঝে তৈরী ক'রে দেবে।'

নীরদ বলল, 'কেন, বিয়ে না করলেও মাঝে মাঝে এ জিনিস তৈরী করে খাওয়াবার লোক মিলবে না নাকি?'

নির্মলা বলল, 'তা মিলবেনা কেন। কিন্তু বাইরের লোকের হাতের জিনিস খেয়ে আর কতদিন মন ভরবে?'

নীরদ বলল, 'মনের কথা আপাতত মনেই থাক। তা বাইরে বলে লাভ নেই! কেউ হয়তো বিশ্বাসই করবেনা সে কথা। যাক, আমি কিন্তু এবার একটা কথা বুঝতে পারছি।'

নির্মলা দুটি আয়ত কৌতূহলী কালো চোখে নীরদের দিকে তাকাল, 'কি কথা।'

নীরদ বলল, 'বরফের হাঁড়ি বয়ে নিতে মনোহরদার কেন কোন কষ্ট হয়না তা আজ বুঝতে পারলাম।'

নির্মলা বলল, 'কিন্তু আজকাল তো উনি নিজে আর বয়ে নেন না।'

নীরদ বলল, 'নিতান্ত বেরসিক তাই। আমি হ'লে চিরকাল বয়ে বেড়াতাম।'

'কেন, বলুন তো।'

'জিনিসগুলি আপনার হাতের তৈরী বলে।'

নির্মলা মুখ টিপে হাসল। 'হুঁ, তাই না আরো কিছু। হাঁড়ি বয়ে বয়ে মাথায় যখন টাক পড়ে যেত তখন?'

নীরদ বলল, 'তা পড়তই বা। সেই টাকে বুলাবার জন্য কাঁকন-পরা একখানা হাত তো সেই সঙ্গে পেতাম।'

নির্মলা বলল, 'রক্ষা করুন, টাক আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।'

মনোহরের মাথায় যে টাকের আভাস দেখা দিয়েছে এ কথাটা বলতে বলতে নীরদ চেপে গেল, তারপব একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু জানেন তো টাকে টাকা আসে।'

নির্মলা বলল, 'কাজ নেই আমার টাকায়।'

খেয়ে দেয়ে বিকালের দিকে নীরদ বিদায় নিল। যাওয়ার সময় আরো একবার প্রশংসা করে গেল নির্মলার কুলপী বরফের। প্রশংসা নির্মলা আরো অনেক শুনেছে। বাজার ভরে সমস্ত লোকই তার হাতের তৈরী জিনিসের তারিফ করে। কিন্তু নীরদের প্রশংসার ভাষা আলাদা। সে কেবল তৈরী জিনিসের প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হয়নি, হাতের গুণগানও করেছে। গুণ অবশ্য মনোহরও তার গায়।

কিন্তু তার গলায় কেবল তার ক্রেতাদেরই প্রতিধ্বনি। একমাত্র নীরদের মুখেই নির্মলা শুনল নতুন সুর, নতুন ভাষা। যা ছিল নিতান্তই গুরুভার প্রয়োজনের বস্তু, দৈনন্দিন জীবিকার পক্ষে অপরিহার্য, তাকে নীরদ যেন নতুন রূপ দিয়ে গেছে। সে কেবল নির্মলার গুণপনার রূপ। নীরদের হাসি পরিহাসে মিশে নির্মলার কুলপী বরফ যেন নতুন স্বাদ পেয়েছে, হয়ে উঠেছে নতুন রকমের সামগ্রী।

তার তৈরী জিনিসে নিত্য নতুন স্বাদ যাতে আসে, জিনিসের উৎকর্ষ যাতে বাড়ে সেদিকে আরও ঝুঁকে পড়ল নির্মলা। মাথা খাটিয়ে রোজ নতুন নতুন ধরণ সে আবিষ্কার করে। নতুন নতুন মশলার ফরমায়েস দেয় মনোহরকে। মনোহর মহাখুশি। বাজারে গিয়ে বসতে না বসতে হাঁড়ি ফুরিয়ে যায়। মাল জুগিয়ে ওঠা যায় না।

মনোহর বলে, 'ঈস্, দু'হাতের বদলে হাত যদি তোর চারখানা হোত নির্মলা, চার মাসের মধ্যে পাকা বাড়ি তুলে ফেলতুম।'

নির্মলার মনে পড়ে যায় তার কেবল একখানা হাতের প্রশংসায় আর একজন কেমন পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

একটু চুপ করে থেকে নির্মলা বলে, 'কিন্তু তা যখন হবার জো নেই আর একটি দু'হাতওয়ালা বউই বরং নিয়ে এসো ঘরে।'

মনোহর বলে, 'উঁহু, তাতে সুবিধা হবে না। সে রকম চার হাতে কেবল হাতাহাতি হবে, কুলপী বরফ তৈরী হবে না।'

যেন হাতাহাতি হবার ভয় না থাকলে মনোহরের তাতে কোন আপত্তি থাকত না।

তারপর থেকে নীরদ প্রায় রবিবারই আসতে লাগল। ছুটি উপভোগের জায়গা হিসাবে স্থানটুকু তার চমৎকার লেগেছে। কর্মব্যস্ত কোলাহলমুখর রাজধানীর এত কাছে এই আধা-সহর আর গ্রামের এক মেটেঘরে যে এমন মাধুর্য তার জন্য প্রচ্ছন্ন ছিল তা কে জানত?

রবিবারও আটটার মধ্যে শিয়ালদ' থেকে বরফ নিয়ে আসে মনোহর। আনে দুধ, চিনি, আরো অন্য সব মশলা। তারপর সুরু হয় নির্মলার কাজ। বরফ কুচোয়, দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীর তৈরী করে, তারপর দ্রুতহাতে সেই বরফের ক্ষীর ছোট ছোট টিনের চোঙাগুলির মধ্যে ভরে শেষে ময়দা দিয়ে আটকে দেয় চোঙার মুখ। যেন অসংখ্য রহস্যের টুকরোকে রাখে আড়াল করে। পিছনের দিকে না তাকিয়েও নির্মলা টের পায়, নীরদ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে হাতের কাজ। বরফের খাবার তৈরী করতে করতে অদ্ভুত এক আনন্দ মনের মধ্যে অনুভব করে নির্মলা, যেন সত্যই এক দুরূহ কলা-কৌশলময় শিল্প-সৃষ্টিতে সে হাত দিয়েছে।

কুলির মাথায় কুলপী বরফের হাঁড়ি চাপিয়ে খেয়ে দেয়ে মনোহর বেরিয়ে পড়ে। আর দাওয়ায় শীতল-পাটি বিছিয়ে নির্মলা নীরদের জন্য করে বিশ্রামের আয়োজন। বাইরে খর রোদ ঝলসাতে থাকে। কিন্তু আমগাছের ছায়ায় ঢাকা এই ছোট্ট উঠান আর ছোট্ট দাওয়াটুকু ভারি স্নিগ্ধ, ভারি ঠাণ্ডা লাগে নীরদের কাছে। ঝির ঝির করে বাতাস বয়। নির্জন নিস্তব্ধ সহরতলী পড়ে পড়ে ঘুমায়। কিন্তু ঘুম আসেনা নীরদের চোখে। আগাছার জঙ্গলের ফাঁকে দেখা যায় রেল লাইনের উঁচু রাস্তা। হুইসল দিয়ে গাড়ি যায়, গাড়ি আসে।

তারপর একসময় পানের রসে ঠোঁট লাল করে পা টিপে টিপে আসে নির্মলা।

'ওমা, এখনো ঘুমোন নি।'

নীরদ বলে, 'না, ঘুমোলেই তো চোখ বুজতে হবে।'

নির্মলা বলে, 'কথা শোন। যেন চোখ মেলে থাকবার জন্য মাথার দিব্যি কেউ দিয়েছে আপনাকে।'

নীরদ বলে, 'মুখের কথায় দেয়নি। কিন্তু মনে মনে হয় তো দিয়ে থাকবে।'

নির্মলা একটু যেন আরক্ত হয়ে ওঠে, বলে, 'বয়ে গেছে মানুষের আপনাকে দিব্যি দেওয়ার। চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে কেবল তো দেখছেন লোহার রেল লাইন।'

নীরদ এবার হেসে চোখ ফিরায় নির্মলার দিকে। বলে, 'কি আর করি বলুন। রেল লাইন ছাড়া আর যা দ্রষ্টব্য এখানে আছে তা ভারি নিষিদ্ধ বস্তু। তাকে চুরি করে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে হয়, সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে থাকা চলে না।'

কথা বলবার ভঙ্গিটা নীরদের জটিল, কিন্তু ইঙ্গিতটা নির্মলার বুঝতে বাকি থাকে না। শব্দের অর্থ সর্বদা বোধগম্য না হলেই বা কি, তার ধ্বনির ব্যঞ্জনাই কি কম অনর্থ ঘটায়।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে নির্মলা বলে, 'যত সব বাজে বানানো কথা আপনার। আসলে আপনি যে কি জন্য ছটফট করছেন তা জানি। কখন গাড়িতে উঠবেন আর কখন গিয়ে পৌঁছবেন কলকাতা তাইতো ভাবছেন মনে মনে?'

নীরদ এক মুহূর্ত নির্মলার দিকে তাকিয়ে কি দেখল। তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে এটা যেন আপনার নিজের মনের কথা।'

নির্মলা একটু যেন চমকে উঠল, বলল, 'ধরুন না হয় তাই-ই। মানুষের বুঝি আর কলকাতা যেতে ইচ্ছা করে না? এত কাছে থাকি অথচ কলকাতা যাওয়া ভাগ্যে আমার যোটে হয়েই ওঠে না।'

'কেন, গেলেই তো পারেন মনোহরদার সঙ্গে।'

'হুঁ, ভালোমানুষ ঠিক করেছেন আপনি। কলকাতা বলতে তিনি তো চেনেন কেবল বৈঠকখানার বাজার। তার ওদিকে নিজেই যেতে সাহস পান না, তারপর আবার আমাকে নেবেন সঙ্গে।'

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সাহস পান না কেন?'

নির্মলা মুখ মুচকে একটু হাসল, 'বোধ হয় ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে।'

নীরদ বলল, 'তার চেয়ে বেশি ভয় বোধ হয় কাউকে হারিয়ে ফেলবার। আর ভয়টা বোধ হয় নিতান্ত অমূলকও নয়'—বলে নীরদও একটু হাসল, 'আচ্ছা ভাববেন না, আমি জোগাড় করে দেব আপনার পাসপোর্ট। চলুন সামনের রবিবার সিনেমা দেখে আসি মিড-ডে ট্রিপে।'

নির্মলার কালো চোখ দুটি যেন একবার চক্ চক্ করে উঠল। কিন্তু মুখে বলল, 'দরকার কি ভাই, কাজ নেই শরীরের অমন ঘোড়া-রোগে। উনি বলেন কলকাতায় গেলেই নাকি আমার মাথা ঘুরে যাবে, আর এই ছোট সহরে ফিরে আসতে চাইব না।'

নীরদের বুকের ভিতরটা কেমন যেন একটু দুলে উঠল, মৃদু কম্পিত

গলায় বলল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে। না ফিরতে চান নাই চাইবেন।'

মনোহর বাড়ী এলে প্রস্তাবটা তার কাছেও পাড়ল নীরদ। বলল, 'ভেবেছি সামনের রবিবার বউদিকে একটু সিনেমা দেখিয়ে আনব কলকাতা থেকে, তুমিও চল মনোহরদা।'

মনোহর স্থিরদৃষ্টিতে নীরদের দিকে তাকাল, তারপর বলল 'ক্ষেপেছিস ?'

নীরদ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কেন, দোষটা কি ?'

মনোহর হেসে উঠল, 'ওই দেখ, চোরের মন বোঁচকার দিকে। দোষের কথা কে বলল। আমি গেলে লোকসান হবে তাই বলছি। বেশ তো, যেতে চাস তোরা যাবি।'

নীরদ বলল, 'না, তুমি না গেলে হবে না।'

মনোহর বলল, 'খুব হবে। কথাটি আমিই তোর কাছে বলব বলব ভাবছিলাম, 'কলকাতা যাব কলকাতা যাব' বলে মাথা আমার খুঁড়ে খাচ্ছিল একেবারে। যেন ভাবি মধু আছে কলকাতায়। তুই যদি ভারটা নিস ভালই হয়।'

নীরদ যে নির্মলার রূপগুণের প্রশংসা করছে, ক্রমশ বাধ্য হয়ে উঠছে তার, এতে মনোহর এক ধরণের গর্বই অনুভব করছিল মনে মনে। এমন কি সমব্যবসায়ী দু' একজনের কাছে একথা সে বলেছেও। নির্মলা যে সত্যিই খুব দামী মেয়ে এ কথা নীরদের মত উচ্চশিক্ষিত, মার্জিতরুচি, ভদ্রসমাজের ছেলের মুখে শুনলে স্ত্রীর সম্বন্ধে অহঙ্কারের ভিত্তিটা আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। এখানকার লোকে তো

নির্মলার প্রশংসা করবেই। তারা ক'টি মেয়েই বা দেখেছে, ঘরের বউ ছাড়া ক'টি মেয়ের সঙ্গেই বা মিশেছে। কিন্তু নীরদ তো আর তেমন নয়। কত মেয়ের সঙ্গে সে কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে, কত পার্টিতে, জলসায়, কত রূপবতী গুণবতীর সান্নিধ্যে এসেছে সে, সুতরাং তার সার্টিফিকেটের দাম আছে।

পরের রবিবার একটু সকালে সকালেই কাজকর্ম সেরে নিল নির্মলা। তারপর মাতলো সাজসজ্জা নিয়ে। চুল বাঁধল, আলতা পরল, সব চেয়ে ভালো শাড়িখানা নামাল বাক্স থেকে, গয়না যে কয়েকখানা ছিল বার করল, তবু মনের মত সাজ যেন আর হয় না।

নীরদ বলল, 'কিছু কমিয়ে টমিয়ে আসুন বউদি। আপনার পাশে লোকে যে আমাকে গমস্তা বলে ভাববে।'

নির্মলা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তার চেয়ে বড কিছু ভাবুক তাই আপনি চান বুঝি।'

নীরদ বলল, 'না না না, অত স্পর্দ্ধা রাখি না।'

বহু সাধাসাধি উপরোধ অনুরোধ সত্ত্বেও মনোহর গেল না তাদের সঙ্গে। কেবল বলতে লাগল, 'তাতে ক্ষতি হবে, লোকসান হবে ব্যবসার।'

গাড়িতে তুলে দেওয়ার সময় বলল, 'সাবধান হে ভায়া, দেখো যেন হারিয়ে টারিয়ে এসনা।'

নীরদ মৃদু হেসে বলল, 'অত যদি ভয় নিজেও চলনা সঙ্গে।'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মনোহর বলল, 'তা ভয় তো মনে

একটু বইলই। এ তো আব যে সে স্ত্রী নয়, একেবাবে আমাব কারবাবেব মূলধন নিয়ে চলেছ সঙ্গে।'

কথাটা নীরদ আব নির্মলা দু'জনেব কানেই হঠাৎ বড স্থূল শোনাল। কিন্তু গাড়ী ছেড়ে দেওয়াব পব বেশিক্ষণ তা আব কাবোবই মনে বইল না।

ছোট খাঁচাব ভিতব থেকে হঠাৎ যেন এক বৃহত্তব পৃথিবীতে ছাডা পেয়েছে নির্মলা। নীবদ মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল উল্লাসে-আনন্দে নির্মলাব রূপ আবও উজ্জ্বল হযে উঠেছে। আবও উচ্ছল, আবও প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে নির্মলাকে।

ইণ্টাবক্লাস কামবায একজন প্রৌঢ ভদ্রলোক উঠে দাঁডিয়ে নির্মলাকে বসবাব জায়গা কবে দিলেন। পাশে একটি যুবক বসে ছিল। সঙ্কোচেব সঙ্গে একটু স'বে এসে সেও নীবদকে বসবাব অনুবোধ জানাল। বলল, 'যেন তেন প্রকাবে আপনিও এখানে এসে বসে যান মশাই। না হলে যে ভদ্রলোক উঠে গেলেন তাঁব আত্মত্যাগ সার্থক হবে না। মিসেস বসবাব জায়গা পেয়েও শান্তি পাবেন না মনে।'

প্রৌঢ ভদ্রলোকটিও মৃদু হাসলেন. বললেন, 'তা যাই বলুন মশাই, ভারি চমৎকার মানিয়েছে এঁদেব। যেন একেবাবে লক্ষ্মীনাবায়ণ।'

নীরদ আব নির্মলা দুজনেই দু'জনাব দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিবিযে নিল। কেউ কোন কথা বলল না।

শিয়ালদ' থেকে দুবার করে ট্রামে উঠতে নামতে হোল। তারপর তারা পৌঁছল এসে সুসজ্জিত সিনেমা হাউসটির সামনে।

ছবিটি বোধ হয় একদিন কি দুদিন আগে মাত্র সুরু হয়েছে। শুভারম্ভের কলার চারা আর মঙ্গল-কলস এখনো রয়েছে দু পাশে।

নির্মলা বলল, 'এ যে একেবারে বিয়ে-বাড়ীর মত সাজিয়েছে দেখছি।'

নীরদ পরিহাসের ভঙ্গিতে বলল, 'তাই তো মনে হচ্ছে। আসুন দেখা যাক, ভিতরে বাসরঘরেরও কোন ব্যবস্থা করেছে কি না।'

সেকেণ্ড ক্লাসের একেবারে পিছনের সারিতে পাশাপাশি দুটি সিটে নির্মলাকে নিয়ে বসল নীরদ। আসল বই আরম্ভ হওয়ার আগে সুরু হবে দেশের সংবাদের চিত্ররূপ ও তারপর একটি কুকুর গিয়ে কি ক'রে চিড়িয়াখানার একপাল ভয়ঙ্কর জন্তু জানোয়ারের মধ্যে পড়ল রঙে বেরঙে তার বিচিত্র কাহিনী।

দেখতে দেখতে নির্মলা একেবারে মগ্ন হয়ে গেল। আর পাতলা অন্ধকারে নির্মলার অস্পষ্ট তনু-দেহটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল নীরদ।

একটু বাদেই আলো জ্বলল। কাঠের ট্রেতে ক'রে একটি সুদর্শন হিন্দুস্থানী ছোকরা কতকগুলি আইসক্রীম নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে, 'লিজিয়ে বাবুজী।'

নীরদ স্মিতহাস্যে দুটি আইসক্রীমের দাম দিয়ে দিল। তারপর একটি নিজের হাতে তুলে দিল নির্মলাকে। আঙুলে আঙুলে লাগল ছোঁয়া। একটা অদ্ভুত অনাস্বাদিত আনন্দে নির্মলার সর্বশরীর শিহরিত

হয়ে উঠল। তারপর কাঁচের ছোট্ট সুগোল সুন্দর বাটিটিতে মুখ ছুঁইয়ে যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই নির্মলা হঠাৎ অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'বাঃ! বেশ চমৎকার হয়েছে তো। অবশ্য আমিও যে এমন না পারি তা নয়। দামী মালমসলা যদি পাই, স্বাদে গন্ধে আমার কুলপী বরফ কেবল বেলঘরিয়া কেন কলকাতার বাজারকেও টেক্কা দিতে পারে।'

পরম আত্মপ্রসাদে আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা নীরদের দিকে ফিরাল নির্মলা।

কিন্তু ততক্ষণে আশেপাশের আরো কয়েকটি সুশ্রী সুবেশা তরুণী সকৌতুকে তাদের দিকে তাকিয়েছে।

মুহূর্তের জন্য লজ্জায় আর অপমানে আরক্ত হয়ে উঠে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল নীরদের মুখ। চাপা ধমকের স্বরে বলল, 'ছিঃ, রক্ষা করো কুলপী বরফ, এখন থাক।'

ভারী একখণ্ড পাথর যেন নির্মলার হৃদয়ের ওপর সশব্দে গিয়ে পড়েছে। বিস্মিত বেদনার্ত চোখ দুটি নীরদের দিকে তুলে ধরল নির্মলা। পুরু চশমার ভিতর দিয়ে নীরদের আরক্ত ঘোলাটে দুটি চোখ দেখা যাচ্ছে। সে চোখে মোহ নেই, মাধুর্য নেই, অদ্ভুত ঘৃণায় আর বিদ্বেষে চোখ দুটি পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

খানিক বাদে নির্মলার ঠোঁটেও তীক্ষ্ণ একটুকরো হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল। আস্তে আস্তে নির্মলা বলল, 'আমার ভুল হয়েছিল ঠাকুরপো।'

নীরদ কোন জবাব দিল না, তার চোখের দৃষ্টিও তখন অন্যদিকে। নির্মলাও ধীরে ধীরে চোখ ফিরিয়ে নিল।

চিত্রগৃহের সব কটি আলোই এতক্ষণে নিভে গিয়েছে। অন্ধকার কালো পর্দায় এবার আসল ছবি আরম্ভ হবে।

ঘুষ

দেখিনি দেখিনি করে শীতাংশু পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ভেবেছিল কিন্তু সদানন্দবাবু প্রায় ছুটে গিয়ে সাইকেলের সামনে এসে দাঁড়লেন, 'আরে শীতাংশু যে, শোন শোন।'

অগত্যা ব্রেক কসে সাইকেলের ওপর থেকেই শীতাংশু বলল, 'আর একদিন শুনব তাঐমশাই, বেলা একেবারে গেছে। একটু জোরে চালিয়ে না গেলে রাত আটটার আগে পৌছতে পারব না।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'আমিও তো তাই বলছি, যতই জোরে চালাও না কেন, পৌছতে পৌছতে তোমার অনেক রাত হয়ে যাবে। চন্দনীর চর কি এখানে নাকি, আর উত্তরে কি রকম মেঘ করেছে দেখেছ! মাঝকান্দীর চক ছাড়াতে না ছাড়াতে নির্ঘাত বৃষ্টি নামবে। এস আমাদের বাড়িতে, রাতটা থেকে কাল ভোরে রওনা হয়ো।'

শীতাংশুর মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। সেও ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিল। অবেলায় মেঘ বাদলের দিনে যাকে আরও দশ বার মাইল জল কাদার খারাপ রাস্তা সাইকেল চালিয়ে যেতে হবে কেউ বাড়িতে রাত্রিবাসের জন্য আমন্ত্রণ করলে তার খুসি হওয়ারই কথা, কিন্তু শীতাংশু তবু খুসী হতে পারছিল না। কারণ সে ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছে, সদানন্দবাবু তিনচার বিঘা জমিতে বেশি পাট বুনিয়েছেন। আর শীতাংশু এই সার্কেলেরই জুটরেজিষ্ট্রেশন অফিসে কাজ করে। তদন্তের ভার তার ওপরই পড়েছে। অবশ্য 'খরচ পাতি'

নিয়ে বরাদ্দের চেয়েও দু'চার বিঘা এদিক ওদিক শীতাংশু অহরহই করে দিচ্ছে। সবাই তাই করে। তাতে গৃহস্থদেরও লাভ, শীতাংশুদেরও লোকসান নেই। কিন্তু দূরসম্পর্কের হলেও সামান্য একটু কুটুম্বিতা সদানন্দবাবুর সঙ্গে তার রয়ে গেছে। শীতাংশুর জেঠতুতো ভাই-এর পিসতুতো শ্বশুর হচ্ছেন মদনপুরের এই সদানন্দ গাঙ্গুলী। তাই শীতাংশু ভেবেছিল এ কেসটা ধরিয়ে দেবে সহকর্মী বিনোদ বোসকে। সে যদি অন্য কেস দিতে পারে ভালোই না হলে তার কাছ থেকে বখরা নিলেই হবে। এ ক্ষেত্রে বিনোদ যত চাপ দিতে পারবে, শীতাংশু ততখানি দিতে পারবে না।

কিন্তু বিষয়টি অন্য রকম ঘুরে গেল। সদানন্দবাবু একেবারে পথ আগলে এসে দাঁড়ালেন। শীতাংশু মনে মনে ভাবল, আচ্ছা দেখা যাক, সেও ঘুঘু কম নয়। কোন রকম বিবেচনার কথা তুললেই শীতাংশুও খরচপত্রের কথা তুলতে সঙ্কোচ করবে না। 'পাঁচজনকে নিয়ে কাজ তাঐমশাই, নিচের ওপরের সকলের দিকেই তাকাতে হয়। একার ব্যাপার তো নয়, তবে কুটুম্ব মানুষ, যেখানে পঞ্চাশ লাগবে, সেখানে আপনি চল্লিশ দিন।'

অত চক্ষুলজ্জা নেই শীতাংশু চক্রবর্তীর। এ কথা সে সদানন্দবাবুকে খুবই বলতে পারবে, হলেনই বা জেঠতুতো ভাইয়ের পিসতুতো শ্বশুর।

তবু একবার এড়াবার শেষ চেষ্টা করল শীতাংশু, 'মিছামিছি আপনাদের কেন কষ্ট দেব তাঐমশাই, এরকম চলাফেরা আমাদের খুব অভ্যাস হয়ে গেছে, বেশ যেতে পারব।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'শোন কথা, কুটুম্বের বাড়ি কুটুম্ব আসবে

তার আবার কষ্ট কি! অবশ্য আমি তো আর বড়লোক কুটুম্ব নই শীতাংশু, পোলাও মাংস করেও খাওয়াতে পারবনা, উপস্থিত মত নিতান্তই দুটি ডাল-ভাত হয়তো সামনে দিতে পারব। তবু এই সন্ধ্যাবেলা বুড়ো মানুষের কথা অমান্য কোরোনা শীতাংশু, এসো, চল আমার সঙ্গে।'

অগত্যা সাইকেল থেকে নেমে পড়তেই হোল। এরপর আর না করা চলেনা। তাছাড়া আজ সত্যিই দেহ যেন বড় বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দুপুরের মেঘভাঙা রোদে বার তের মাইল একটানা সাইক্লিং করতে হয়েছে শীতাংশুকে। আর সে কি রাস্তা। কোথাও জল কোথাও কাদা। এই যদি বা সাইকেলে চাপে, পরক্ষণেই সাইকেল চাপে এসে ঘাড়ে। তারপর ছোট বড সবাই আজকাল চালাক হয়ে গেছে। সহজে গাঁট থেকে পয়সা বের করতে চায়না। অজস্র বক্তৃতা, ধমক আর চোখ-রাঙানির ফলে যখন তারা নরম হয়ে আসে তখন ক্লান্তিতে নিজেরও চোখ প্রায় বুজে আসতে চায়। বেছে বেছে শীতাংশু আচ্ছা ঝকমারীর কাজ নিয়েছে যা হোক। সীজনের সময়টা রোদ নেই বৃষ্টি নেই সারাদিন প্রায় মাঠে মাঠেই কাটে। বিনিময়ে মাস অন্তে পচাত্তর টাকা। ঘুষ! ঘুষ না নিলে কি বাঁচবার জো আছে নাকি। আর তো সম্বল দাদার পঁচিশ টাকার মাইনের এম, ই, স্কুলের মাষ্টারী।* ভাইপো ভাইঝিদের সংখ্যা বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। অফিসের একটি ঘর কর্তৃপক্ষ থাকবার জন্য ছেড়ে দিলেও চন্দনীর চরের মত অমন একটা গেঁয়ো বাজারেও খোরাক পোষাক চা সিগারেটে পঞ্চাশ টাকায় কুলোয় না।

বাঁচতে হলে এদিক ওদিক সবাইকে আজকাল করতে হয়। কর্তৃপক্ষের এক আধটু ভয় ছাড়া অন্য কোনরকম শুচিবায়ু শীতাংশুর নেই। আর চারদিকে আট-ঘাট বেঁধে কি করে চলতে হয় এই আড়াই বছরে তা সে ভালোই রপ্ত করে নিয়েছে।

দু'পাশে পাটের জমি। মাঝখানের আধ হাত খানেক চওড়া আলের রাস্তা। কচি কচি দুর্বা গজিয়েছে আলের ওপর। সাইকেলটি হাত দিয়ে ঠেলে নিয়ে শীতাংশু সদানন্দবাবুর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। সবুজ পাটের চারা গজিয়েছে দুদিকের জমিতে। এখনো হাঁটু অবধি ওঠেনি গাছ। দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে নু'য়ে নু'য়ে পড়ছে। অবশ্য এখানে ওখানে বহু জমিই খালি পড়ে আছে। বরাদ্দ না থাকায় গৃহস্থেরা ওসব জমিতে পাট দিতে পারেনি। দেখতে দেখতে শীতাংশু এগিয়ে চলতে লাগল। বে-আইনী চাষের জন্য সোনাকান্দী গাঁয়ের দু'তিনখানা বড় বড় জমি শীতাংশু আজ ভেঙে ফেলবার হুকুম দিয়ে এসেছে। সে জমিগুলোর পাট এর চেয়েও বড় আর ঘন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা ঠিক শীতাংশুর চাহিদা মেটাতে পারেনি। কেউ কেউ আবার ঔদ্ধত্যও দেখিয়েছিল। না এসব কাজে দয়া-মায়া চলেনা। দোষ ঘাট হলে শীতাংশুকেই বা দয়া দেখায় কে। তাছাড়া মানুষের কাছ থেকে ভয় শ্রদ্ধা আর উপুরি পাওনা পেতে হলে কিছু বেশি পরিমাণে নিষ্ঠুর নৃশংস হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পথে বহু চাষী গৃহস্থদের সঙ্গেই দেখা হতে লাগল। সসম্ভ্রমে সবাই শীতাংশুকে নমস্কার জানাল। জনকয়েক বর্গাদার মুসলমান চাষী জমি থেকে তখনো ঘাস নিড়াচ্ছে। তারা

হাত তুলে সেলাম জানাল। শীতাংশু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে জবাব দিতে দিতে এগুতে লাগল সদানন্দের পিছনে পিছনে।

বাড়ির সামনে একটি পানাভরা মজা পুকুর। চার পাশ থেকে নানা আগাছার জঙ্গল ঝুঁকে পড়েছে। তালের মধ্যে দু'একটা আম আর খেজুর গাছ আছে মাঝে মাঝে। পুকুর পারের সেই আগাছার ভিতর দিয়েই সরু সাদা একটু পথ কুমারীর সিঁথির মত সোজা একেবারে বাড়ির উঠানে গিয়ে পৌঁচেছে।

বছর পাঁচ ছয় আগে সদানন্দবাবুর মেজো মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে শীতাংশু যখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিল তখন বাড়ির আশপাশ এমন জংলা ছিলনা। পুকুরটিও বেশ পরিষ্কার ছিল বলে মনে পড়ছে।

কিন্তু উঠানের ভিতর গিয়ে শীতাংশুর চোখে পড়ল আগের চেয়ে বাড়িই কেবল জঙ্গলা হয়নি, ঘরদোরও জীর্ণ হয়ে পড়েছে। দুদিকে বারাণ্ডা ঘেরা উত্তরে ভিটির বড় ঘরখানা নড়বড়ে অবস্থায় কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। পূবের ভিটির অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরখানার অবস্থাও তথৈবচ। দুই মেয়ের বিয়েতে কিছু খামার জমি ছুটেছে, আর সালিশী বোর্ডের বিচারে কয়েক বিঘা মর্গেজী জমিও যে হারাতে হয়েছে সদানন্দবাবু ত' শীতাংশুকে আগেই শুনিয়েছিল। তবু ওঁর অবস্থা যে সত্যিই এতখানি খারাপ হয়েছে তা তার ধারণা ছিল না।

সদানন্দবাবু উঠান থেকেই ডাকতে ডাকতে চললেন, 'ওরে ও কুন্তলা, ও চুণী টুনি, দেখ এসে কে এসেছে। এসো বাবা ঘরে এসো।'

পিছনে পিছনে শীতাংশু ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। বছর সতের

বয়সের একটি তন্বী শ্যামবর্ণা মেয়ে এদিকে একবার মুখ বাড়িয়েই আড়ালে চলে গেল। পাঁচ ছয় বছরের ছোট ছোট আর দুটি মেয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সামনে।

শীতাংশু একটু ইতস্তত করে বলল, 'মাঐ মা কোথায়?'

সদানন্দবাবু একটু যেন বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'কোথায় আবার, আঁতুড়ে। কাল গেলে মাংটামি সার বাবা। এক জন্ম ধরে দেখলুম তো কেবল মেয়ে আর মেয়ে। গুটি তিনেক তবু মরে গিয়ে রেহাই দিয়েছে। এখন নিজের মরবার আগে ভাগ্য হোল পুত্র দেখবার। তাতো হোল, কিন্তু বলোতো বাবা লাভটা হোল কি, শিখিয়ে পরিয়ে এ ছেলেকে কি মানুষ করবার সময় মিলবে, না এর রোজগার খেয়ে যাওয়ার বেড পাব আয়ুতে। ভগবানের উপহাস ছাড়া আর একে কি বলব বলো তো শীতাংশু।'

কি বলবে শীতাংশুও হঠাৎ ভেবে পেলনা। তবে এটুকু লক্ষ্য করল সবটুকুই হয়তো ভগবানের উপহাস নয়। কিন্তু অতিরিক্ত বিলম্ব ঘটে গেলেও শেষ পর্যন্ত পুত্রসন্তান যে লাভ হয়েছে তার প্রসন্ন পরিতৃপ্তি প্রৌঢ় পিতার বাচনিক নৈরাশ্যে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েনি।

সদানন্দবাবু আবার হাঁক দিলেন, 'কোথায় গেলি কুন্তলা, চেয়ারটা এগিয়ে দে শীতাংশুকে। ওর কাছে আবার লজ্জা কিসের তোর। আচ্ছা থাক, থাক, আমিই না হয় আনছি।'

কিন্তু আনত মুখে কুন্তলা ততক্ষণে একটা হাতল ভাঙা কাঠের চেয়ার টেনে নিয়ে এসেছে। শীতাংশু একবার তার দিকে তাকাল। বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে এসে এই কুন্তলাকেই সে কি পাঁচ ছয় বছর

আগে এঘরে ওঘরে ছুটাছুটি করতে দেখেছিল? দূর থেকে হাসতে হাসতে তার গায়ে হলুদ জল ছিটিয়ে দিয়েছিল কি এই শান্ত নিরীহ মেয়েটিই! বিশ্বাস করা শক্ত।

পাশের ছোট তক্তপোষখানায় নিজে বসে সদানন্দবাবু চেয়ারটা শীতাংশুকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো বাবা বোসো।'

এই ঘরেরই পশ্চিম কানাচে ছোট একটু ঢাকা বারাণ্ডায় আঁতুড়। সুরলক্ষ্মী সেখান থেকে বলে উঠলেন, 'চটের আসনখানা চেয়ারের ওপর পেতে দে কুন্তী। নইলে ছারপোকার জ্বালায় একদণ্ডও বসতে পারবেনা।'

সবুজ সুতোয় লতা আর ফুল তোলা একখানা আসন চেয়ারের ওপর পেতে দিল কুন্তলা। শীতাংশু সেই আসন ঢাকা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'আবার চেয়ারের হাঙ্গামা কেন এত। কুন্তলা তো আজকাল ভারি শান্ত হয়ে গেছে। কথাই বলেনা।'

সুরলক্ষ্মী আঁতুর থেকেই বললেন, 'শান্ত না ছাই। দু'দণ্ড বস, তাহলেই দেখতে পারবে।'

শীতাংশু বলল, 'তাই নাকি কুন্তলা?'

কুন্তলা মুখ মুচকে একটু হাসল, 'কি জানি। কথা বলিনি, তাতেই তো একদফা নালিশ হয়ে গেল শুনলেন তো। আর গোড়াতেই কথা বলতে সুরু করলে মা যে আরো কত কি বলতেন তার ঠিক নেই।'

সুরলক্ষ্মী আঁতুর ঘরের দোরের একটি পাট ততক্ষণে খুলে দিয়েছেন। শীতাংশুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হতচ্ছাড়া মেয়ের

ভঙ্গি দেখ কথার। কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বললেই হবে, না হাতমুখ ধোবার জল টল এনে দিবি শীতাংশুকে।'

কুন্তলা অপূর্ব ভ্রুভঙ্গি করে বলল, 'দিচ্ছি মা দিচ্ছি, তুমি শুধু চুপ করে দেখে যাও। তুমি আটকা আছ বলে সাধ্যমত আমরা কুটুম্বের অযত্ন করব না।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'আহাহা, সাধ্যের তো আর সীমা নেই। যত্ন করবার কত যেন সামগ্রী আছে ঘরে।'

এরপর আঁতুড় ঘরের সামনে এগিয়ে গিয়ে কুন্তলা ফিস ফিস করে মার কাছে কি বলল, তারপর আরও কি কি বলবার জন্য বাবাকে ডেকে নিয়ে গেল আড়ালে।

বেড়ার আড়াল থেকে সদানন্দবাবুর অনুচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল, 'বাড়ুয্যেরা চাইলেও দেবেনা। তবে দত্তদের বাড়িতেই বোধ হয় পাওয়া যাবে। কলকাতা থেকে সেদিনও তাদের চা আসতে দেখেছি।'

কুন্তলার ফিস ফিস গলাও একটু একটু যেন কানে গেল শীতাংশুর, 'আস্তে বাবা আস্তে।'

ঘরে এসে ছাতাটা নিয়ে সদানন্দবাবু আবার বেরিয়ে গেলেন।

শীতাংশু বাধা দিয়ে বলল, 'এই জলবৃষ্টির মধ্যে মিছিমিছি আবার কোথায় চললেন তাঐমশাই।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'এক্ষুনি আসছি বাবা, তুমি ততক্ষণ হাতমুখ ধুয়ে নাও।'

শীতাংশু আর কোন কথা বলল না। সদানন্দবাবুর ছাতাটির দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। ছোটবড় গোটা তিনেক

তালি পড়েছে ছাতায়। নতুন নতুন আরো গোটা কয়েক যে ছিদ্র বেড়েছে তাতে বোধ হয় এখনো তালি দেওয়ার অবকাশ পাননি কিংবা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু বৃষ্টি যে রকম বড় হয়ে এসেছে তাতে মালিকের মাথা ও-ছাতা কতক্ষণ শুকনো রাখতে পারবে শীতাংশু মনে মনে একবার না ভেবে পারল না।

এতক্ষণ ঘরে লক্ষ্মীর আসনের কাছে মাটির দীপে সরষের তেলের আলো জ্বলছিল কুন্তলা এবার একটি হারিকেন জ্বেলে আনল। চিমনির একটি জায়গায় সামান্য একটু ফাটা কিন্তু বাকিটা কুন্তলা চুণ দিয়ে পরিষ্কার করে মেজে এনেছে। ছোট আকারের হারিকেন। কিন্তু তারই আলোয় সমস্ত ঘরখানা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কুন্তলা বলল, 'আসুন, ওদিকে জল দিয়েছি বালতিতে। হাতমুখটা ভালো করে ধুয়ে ফেলবেন। চিনু গামছাখানা নিয়ে আয় তো এখানে।'

চিনু এতক্ষণে একটা কাজের ভার পেয়ে খুসি হয়ে বলল, 'এক্ষুনি আনছি দিদি।'

তার ছোট টুনু অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'আমি কি আনব দিদি।'

কুন্তলা জবাব দিল, 'তুমি শীতাংশুদার কড়ে আঙুল ধরে নিয়ে এসো।'

বারাণ্ডা থেকে কুন্তলার খিল খিল হাসির শব্দ শোনা গেল। সুরলক্ষ্মীও হাসি চাপতে চাপতে বললেন, 'হতচ্ছাড়ী কোথাকার।'

শীতাংশু বারাণ্ডায় উঠে গিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'কেউ এসে কড়ে আঙুল ধরুক, খুব বুঝি সখ?'

কুন্তলা ইঙ্গিতে মায় আঁতুড়ঘরের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে একটু হতাশ ভঙ্গি করল। অর্থাৎ এ প্রশ্নের যথাযথ জবাব সে এখনি দিত যদি না মা থাকতেন ওখানে।

কুন্তলা বলল, 'এবার ভালো ছেলের মত হাতমুখটা ধুয়ে নিন। আর সাহেবী বেশটা কি পরাণ ধ'রে ছাড়তে পারবেন? তাহলে কাপড় এনেদি।'

শীতাংশু বলল, 'আনো। যে বেশ তোমার এতখানি চক্ষুশূল তা বেশিক্ষণ পরে থাকতে ভরসা হয় না।'

হাত মুখ ধুয়ে প্যাণ্ট ছেড়ে ফেলে চুলপেড়ে একখানা ধুতি পরল শীতাংশু। কুন্তলা সেখানেই আয়না চিরুণী নিয়ে এল। আয়নাখানা শীতাংশুর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'দেখুন এবার মানিয়েছে কিনা।'

শীতাংশু মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মানিয়েছে যে তা তোমার মুখচোখেই দেখতে পাচ্ছি, কষ্ট করে এর জন্য আর আয়না আনবার দরকার ছিলনা।'

মুখ মুচকে শীতাংশু একটু হাসল।

কথায় কথায় কখন একেবারে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল কুন্তলা, শীতাংশুর কথার ইঙ্গিত বুঝে তাড়াতাড়ি লজ্জিত হয়ে সরে দাঁড়াল। শীতাংশু তার সেই লজ্জারুণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন! এবার? আচ্ছা জব্দ হয়েছ তো? খুব তো বক্ বক্ করছিলে।'

কুন্তলা কোন জবাব দিল না। শীতাংশু প্রসঙ্গটা পালটে নিয়ে বলল, 'কিন্তু তাঐমশাইকে এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় পাঠালে

বলোতো। চায়ের কি দরকার ছিল। চা যে আমি খাই সে কথা কে বলল তোমাকে।'

কুন্তলা যেন আর একবার আরক্ত হয়ে উঠল, বলল, 'কে আবার বলবে। কে কি খায় না খায় আমরা মুখ দেখলেই বুঝতে পারি।'

একটু বাদেই সদানন্দবাবু ফিরে এলেন। থালায় করে মুড়ি গুড়, আর নারকেলকোরা দিয়ে জলখাবার নিয়ে এল কুন্তলা, বলল, 'একেবারে গ্রামদেশী খাবার। সেইজন্যই আপনার বিদেশী সাহেবী বেশটা তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিলাম, বুঝেছেন?'

সুরলক্ষ্মী আবার বললেন, 'হতচ্ছাড়ীর কথার ভঙ্গি দেখ।'

চিনু আর টুনুর হাতে কিছু মুড়িগুড় তুলে দিল শীতাংশু। তারপর কুন্তলা নিয়ে এল চা। বলল, 'চা খাওয়ার তো আপনার অভ্যাস নেই, ধীরে ধীরে দেখেশুনে খাবেন, দেখবেন মুখ যেন পুড়িয়ে ফেলবেন না।'

সুরলক্ষ্মী ধমকের সুরে বললেন, 'পোড়ারমুখী এবার একটু থাম দেখি। মানুষ দেখলে ওর এত আনন্দ হয় শীতাংশু যে ও কি করবে, কি বলবে ভেবে পায় না। ফুর্তিতেই অস্থির।'

শীতাংশুও চেয়ে চেয়ে তাই দেখছিল। এই বয়সে এমন সপ্রতিভ বাকপটু মেয়ে সে যেন এর আগে আর দেখেনি। খানিকক্ষণ আগে দেহমনে যে ক্লান্তি ছিল শীতাংশুর তা যেন সম্পূর্ণ ঝরে পড়ে গেছে। এমন আনন্দ, এমন প্রসন্নতার স্বাদ দীর্ঘকাল ধরে পায়নি শীতাংশু। অফিসের কাজের চাপে অনেকদিন বাড়ি যেতে পারেনি। আর বাড়ি গেলেই বা কি। গেলেই মা আর বউদির একের বিরুদ্ধে আর

একজনের নতুন নতুন নালিশ। অভাব অনটনের সংসারে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। একপাল ছেলেমেয়ের হাতাহাতি মারামারি চলছে সবসময়। বাড়ি গেলেও দুঘণ্টার মধ্যে শীতাংশুকে অস্থির হয়ে উঠতে হয়। এখানকার মত এমন শান্ত নিরবচ্ছিন্ন পরিতৃপ্তির মুহূর্ত বহুকাল ভাগ্যে জোটেনি শীতাংশুর। বাড়ির বাইরের জঙ্গল আর ভিতরের ঘরদোরের জীর্ণতা দেখে শীতাংশু আশাই করতে পারেনি যে এর মধ্যেও এমন একটি আনন্দের নীড় আত্মগোপন ক'রে রয়েছে।

সুরলক্ষ্মী খুঁটে খুঁটে বাড়িঘরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শীতাংশুর দাদা বউদি মা, ভাইপো ভাইঝিদের কে, কেমন আছে শুনতে চাইলেন। খুকুর সঙ্গে (শীতাংশুর সেই জেঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী) অনেককাল দেখাসাক্ষাৎ হয় না উল্লেখ করলেন সে কথা।

তারপর উঠল শীতাংশুর অফিসের প্রসঙ্গ। শীতাংশু বলল অল্প মাইনে আর অতিকষ্টের চাকরি। তাওতো ডিপার্টমেন্ট এখনো স্থায়ী হোলনা। চাকরি কবে আছে কবে নেই তারই বা ঠিক কি। পাটের সময় তো প্রায় সর্বদা মাঠেমাঠেই বেড়াতে হয়। ফিরে গিয়ে দুদিন যে একটু শান্তিতে নিশ্বাস নেবে তারও জো নেই। আড়িয়ালখাঁ নদীর পারের চর। তারই গাঁঘেষে অফিস। টুল টেবিল সরিয়ে রাত্রে তার মধ্যেই শোয়ার জায়গা করে নিতে হয়। শুয়ে শুয়ে কানে আসে নদীর অন্য পার ঝুপ ঝুপ করে অনুক্ষণ ভেঙে পড়ছে তো পড়ছেই। এদিকে জাগছে চরের পর চর। আর কিচ কিচ করছে বালি। হাওয়া একটু জোরে বইলেই সে বালি উড়ে আসে চোখে মুখে বিছানাপত্রের মধ্যে। ঝাড়াপোছার পর বিছানা

বালিস থেকে যদি বা সে বালি যায়, মনের ভিতর থেকে কিছুতেই তা দূর হতে চায়না। সেখানে দিনভর রাতভর বালি কেবল কিচ কিচ করতেই থাকে।

সদানন্দ আর সুরলক্ষ্মী দুজনেই সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। সবই ভাগ্য। নইলে বিদ্যাবুদ্ধি তো নেহাৎ কম নয় শীতাংশুর। দেখতে শুনতে বলতে কইতেও এমন ছেলে গণ্ডায় গণ্ডায় মেলে না। কিন্তু কপাল। সুরলক্ষ্মী আঙুল দিয়ে নিজের কপাল দেখিয়ে বললেন, 'সব এই চার আঙুল জায়গাটুকুর মধ্যে লেখা আছে বাবা। তার বাইরে কারোরই যাওয়ার জো নেই।'

অন্য কোন কুটুম্ব স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে নিজের সামর্থ সম্বন্ধে দৈন্য কখনো প্রকাশ করেনা শীতাংশু। খুঁৎ খুঁৎ করে না ভাগ্য নিয়ে। বরং যতটুকু শক্তি তার চেয়ে বড়াই করে বেশি, বড বড চাল দেয়। কিন্তু সুরলক্ষ্মীর কথার ভঙ্গিতে এত গভীর স্নেহ আর মমতা প্রকাশ পেল যে তার মাধুর্যে দুঃখ আর দারিদ্র্যও যেন নতুন রকমের উপভোগ্য বস্তু হয়ে উঠল শীতাংশুর কাছে। এমন স্নেহার্দ্র সান্ত্বনা যখন আছে তখন দুঃখে আর ভয় কি।

সদানন্দবাবু বললেন, 'কিন্তু দৈব যেমন আছে তেমনি আছে পুরুষকার। মহাভারতের কর্ণের কথা মনে আছে তো। আর তোমাদের তো এই উঠতি বয়স। বাধা বিঘ্ন ঠেলে পথ করবার এইতো সময়। তোমাদের তো হতাশ হলে চলবে না বাবা শীতাংশু। কতজনকে আশা দেবে তোমরা, বলভরসা দেবে, কতজন তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকবে, নির্ভর করবে তোমাদের ওপর।'

অতি প্রচলিত গতানুগতিক কথা। কিন্তু শীতাংশুর মনে হতে লাগল এ সব যেন সে আজ নতুন শুনছে। কেবল হিত কথাই নয়, সঙ্গীতের মত সদানন্দবাবুর এসব কথারও যেন সুর আছে, ক্ষমতা আছে মনোহরণের।

কুন্তলা রান্নার আয়োজনে লেগে আছে। মাঝে মাঝে ফিসফিস করে কি জিজ্ঞাসা করছে এসে মায়ের কাছে, পরামর্শ নিয়ে যাচ্ছে তাঁর।

সদানন্দবাবু বললেন, 'জোর করে তোমাকে পথ থেকে ধরে তো নিয়ে এলাম শীতাংশু, আদর আপ্যায়ন যা হবে তা ভগবানই জানেন।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'থাক্ থাক্, ভগবানের আর দোষ দিয়ো না, বাদলা বৃষ্টির জন্য গত হাটে গেলে না। আচ্ছা বেশ, কিন্তু সকালে তো বৃষ্টি ছিলনা—এত করে বললাম বাজারটা করে এস যাও, তা দাবা নিয়ে বসা হোল চাটুয্যে বাড়ি। পুরুষমানুষের এত গাফলেতি থাকলে কপালে কি কোন দিন সুখ হয়। এখন শুধু শুধু ডাল ভাত আমি কুটুম্বের ছেলের সামনে কি করে দিই।'

শীতাংশু বলল, 'আদর আপ্যায়ন কি কেবল খাওয়া পরার মধ্যেই আছে মাঐমা? কুটুম্বের ছেলে বলে কি তাকে অতই পর ভাবতে হয়?'

রান্নাঘর থেকে কুন্তলা এসে উপস্থিত হোল, 'আচ্ছা আপনি যে কেবল মা আর বাবার সঙ্গেই বসে বসে কথা বলছেন, ওঁরা ছাড়াও যে এখানে আরো দুটি প্রাণী আছে তাদের কথা কি আপনি একেবারেই ভুলে গেলেন?'

শীতাংশু একটু বিস্মিত হয়ে কুন্তলার দিকে তাকাল। কুন্তলা মুখ টিপে হেসে বলল, 'চুন্নু আর টুন্নুর কথা বলছি। ওরা যে কতক্ষণ ধরে সেজেগুজে বসে আছে আপনাকে নাচ দেখাবে বলে?'

শীতাংশু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ও তাই নাকি? তা এতক্ষণ বলনি কেন?'

কুন্তলার নির্দেশে চুন্নু আর টুন্নুর নাচগান আরম্ভ হয়ে গেল:

'আমার কৃষ্ণ কানাই এল, রুণু রুণু রুণু ঝুণু রে।'

একেবারে অপূর্ব মৌলিক পরিকল্পনা। শীতাংশু হেসে বলল, 'বেশ, বেশ। তা' এসব তোমরা শিখলে কোথায়?'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'কোথায় আবার শিখবে! সব কুন্তলার কাণ্ড। চাটুয্যে বাড়ির সেজমেয়ে থাকে কলকাতায়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিন পনেরের জন্য এসেছিল বাপের বাড়িতে। ওদের নাচতে গাইতে বুঝি দিন দুয়েক দেখে এসেছিল কুন্তলা বোনদের নিয়ে। তারপর বাড়িতে এসে বললে তোদেরও নাচতে হবে। আমার সব মনে আছে, ভুল হলে আমি ঠিক করে দেব। আচ্ছা একখানা মেয়ে হয়েছে বাবা। তারপর থেকে দিন নেই রাত নেই চুন্নু টুন্নুদের টেনে হেঁচড়ে মারধোর করে—'

তারপর হাসতে লাগল শীতাংশু। তারপর উঠে বারাণ্ডায় গেল সিগারেট ধরাতে।

কুন্তলা গেল পিছনে পিছনে; 'নাচ কি রকম দেখলেন বললেন না তো।'

শীতাংশু সহাস্যে বলল, 'বারে বললাম যে। বেশ চমৎকার হয়েছে। কিন্তু চুমু টুমুর নাচ তো দেখলুম এবার তোমার নাচটা কখন দেখব।'

কুন্তলা বলল, 'অসভ্য কোথাকার। আমি নাচতে জানি নাকি যে নাচ দেখবেন আমার।'

শীতাংশু সকৌতুকে হাসল, 'ও নাচতে জানো না বুঝি। তা কি জানো তুমি?'

কুন্তলা আরও একটু কাছে এগিয়ে এল শীতাংশুর, ভ্রূদুটিতে অপূর্ব ভঙ্গি এনে বলল, 'নাচাতে গো নাচাতে।'

তারপর খিল খিল করে হেসে উঠে ফের চলে গেল রান্নাঘরে।

ঘণ্টাদুয়েক বাদে ডাক পড়ল খাওয়ার। বড় ঘরের মেঝের সেই লতাফুলওয়ালা আসনখানা কুন্তলা পেতে দিল সযত্নে। কাঁসার বড় একখানা ছড়ানো থালায় এলো মোটা মোটা রাঙা চালের ভাত। দুটো ডাল, ভাজা, মাংসের মত করে বাঁধা সিঙ্গি মাছের ঝোল, একটু টক, আর তারপব বড় একটি বাটির তলায় সামান্য একটু দুধ। উপকরণে বাহুল্য নেই, কিন্তু যত্ন আর আন্তরিকতা যেন চোখে দেখা যায়। এমন তৃপ্তি আর পরিতুষ্টির সঙ্গে শীঘ্র কোথাও যেন আর খায়নি শীতাংশু।

সুরলক্ষ্মী বলে চললেন, 'ভাগ্যে জিয়ানো মাছ দুটি দত্তদের বাড়িতে পাওয়া গিয়েছিল। কি রকম কি রেঁধেছে কে জানে। নিজে তো কিছু দেখতেও পারলাম না, করতেও পারলাম না।'

শীতাংশু বলল, 'চমৎকার রান্না হয়েছে মাঐমা। দেখবার করবার এরপর আপনার কিছু আর ছিলনা।'

ঘটিতে করে আঁচাবার জল দিল কুন্তলা বারাণ্ডায়। টিপটিপ করে তখনো বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। কুন্তলা বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়েই আঁচান। ধুয়ে যাবে।'

শীতাংশু খানিকটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের ভঙ্গিতে বলল, 'ধুয়ে যে যাবে সেই তো হয়েছে চিন্তা। আঁচাব কিনা ভাবছি। জলেব ঘটি তুমি বরং ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

কুন্তলা বলল, 'কেন?'

শীতাংশু বলল, 'রান্নাব স্বাদটুকু ঠোঁটে মুখে মেখে বাখতে ইচ্ছা করছে। জল দিলে তো ধুয়েই যাবে।'

কুন্তলা হেসে বলল, 'তা'হলে ধুয়ে কাজ নেই। শুকনো গামছা দিচ্ছি। মুখটা একটু মুছে ফেলুন, তবু খানিকটা স্বাদ থাকবে।'

শীতাংশু বলল, 'উঁহু, মুছিই যদি শুকনো গামছায় মুখ মুছে আর লাভ কি।'

কুন্তলা বলল, 'তবে কিসে মুছবেন।'

শীতাংশু একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আঁচলে গো আঁচলে।'

পূবের সেই ছোট্ট টিনের ঘরখানির একদিকে ধানের গোলা, আর একদিকে একখানি তক্তপোষ পাতা। পাটের সময় পাট রাখা হয়, অন্য সময় খালিই পড়ে থাকে। কুটুম্বস্বজন অতিথি অভ্যাগত

কদাচিৎ কেউ কখনো এলে শুতে দেওয়া হয় সেখানে। বাপ আর মেয়েতে মিলে বিছানাপত্র টানাটানি করে নিল সেই ঘরে। সুরলক্ষ্মী আঁতুড় ঘর থেকেই ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, 'কাঠের বড় বাক্সটার মধ্যে দেখ ধোয়া চাদর আর মশারিটা রয়েছে। পাতলা কাঁথাখানাও বের করে দিস যদি শীত শীত করে শেষ রাত্রে গায়ে দেবে, আলমারীর মাথার ওপর দড়ি আর পেরেক পাবি, বোধ হয় বোঁচকাটার তলায় পড়ে গেছে। একটু খুঁজে দেখ কুন্তী, সবই আছে ওখানে।'

কুন্তলা বলল, 'ব্যস্ত হয়োনা মা, কোথায় কি আছে আমি জানি। সব আমি ঠিক করে নিতে পারব।'

কিছুক্ষণ ধরে ও ঘর থেকে ঝাড়া পোঁছা আর পেরেক ঠুকবার শব্দ এল। তারপর সদানন্দ চলে এলেন। কুন্তলা লাগল বিছানা পাততে। খানিক পরে এ ঘরে এসে বলল, 'যান শোন গিয়ে, হয়ে গেছে আপনার বিছানা।'

শীতাংশু বলল, 'এত তাড়াতাড়ির দরকার ছিল কি। তোমাদের তো এখনো খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত হয়নি।'

কুন্তলা বলল, 'হ্যাঁ, তা বাকি রেখেছি। সেই ভাবনায় যদি কিছুক্ষণ ঘুম আপনার বন্ধ থাকে। না হলে তো শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাক ডাকতে সুরু করবেন।'

শীতাংশু বলল, 'আমার নাক ডাকে কিনা তুমি কি করে জানলে।'

কুন্তলা বলল, 'নাক দেখলেই আমরা বুঝতে পারি।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'যাও বাবা, তুমি শোও গিয়ে।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'হ্যাঁ, আর রাত কোরোনা। সারাদিন খাটুনি

আর ঘোরাঘুরি গেছে রোদবৃষ্টির মধ্যে। এবার শুয়ে বিশ্রাম করো গিয়ে।'

কুন্তলা বলল, 'দোর দেবেন না যেন। আমি একটু পরেই গিয়ে জলটল দিয়ে আসব। কি শীত কি গ্রীষ্মে রোজ রাত্রে আমার জল পিপাসা পায়। ঢক ঢক করে জল এক গ্লাস খাই তারপরে ফের ঘুম আসে।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'বিশ্বশুদ্ধ সবাই বুঝি তোর মত ভেবেছিস ?'

এরপর শীতাংশু পূবের ঘরে উঠে গেল শোয়ার জন্য। হারিকেনটি জ্বলছে এক পাশে। বিশেষ যত্ন করে পাতা হয়েছে বিছানা। দক্ষিণ শিয়রে দুটি বালিশ। সাদা ঢাকনির এককোণায় নীল দুটি পাতার আড়ালে লেখা কুন্তলা। বিছানার চাদরটি শুভ্র পরিচ্ছন্ন। শীতাংশুর মনে হোল এই অম্লান শুভ্রতা কেবল যেন এই শয্যাটিরই নয়। আর একটি কুমারী হৃদয়ের সানুরাগ শুচিশুভ্র পবিত্রতা এর সঙ্গে মিশে রয়েছে।

খানিকবাদে সত্যিই জলের ঘটি হাতে কুন্তলা এল ঘরে। তার সেই কালোপেড়ে আধময়লা শাড়িটা ছেড়ে পরেছে পুরোণ ফিকে হয়ে যাওয়া ধানী রঙের আর একখানা শাড়ি। বোধ হয় রাঁধতে গিয়ে আগের শাড়িখানা এঁটো হয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু শীতাংশুর মনে হোল শুধু সেইজন্যেই নয়।

তক্তপোষের তলায় কিনার ঘেষে জলের ঘটিটা রাখল কুন্তলা, একটি পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে কাঁচের গ্লাসে ঢেকে দিল তার মুখ। তারপর মুহূর্তকাল চুপ করে একটু দাঁড়াল। শীতাংশু তার দিকে আর একবার

তাকিয়ে দেখল। মনে পড়ল সাইকেল নিয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একদিন ক্লান্ত হয়ে একটা আমগাছে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম করতে বসেছিল, হঠাৎ তার চোখ পড়ল শস্যভরা সামনের ছোট একখানি ক্ষেতের দিকে। এমন সবুজ শস্যের ক্ষেত তো শীতাংশু যেতে আসতে অহরহই দেখছে কিন্তু সেদিন যেন নতুন ক'রে দেখল, নতুন চোখে। কোথায় গেল ক্লান্তি, কোথায় গেল বিরক্তি আর অপ্রসন্নতা। সমস্ত হৃদয় মন যেন জুড়িয়ে স্নিগ্ধ হয়ে গেল। শীতাংশু অনেকক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইল সেই শস্যের ক্ষেতের দিকে।

কুন্তলার চোখে আর একবার চোখাচোখি হোল শীতাংশুর। সেই মুখরা মেয়ের চঞ্চল চোখ দুটি যেন এ নয়। শস্যের ক্ষেতের ওপর এ যেন এক টুকরো মেঘ করা আকাশ—স্নিগ্ধ, শ্যাম, সুগম্ভীর। শীতাংশু ভাবল কুন্তলা হয়তো কিছু বলবে, কুন্তলা ভাবল হয়তো কোন কথা বলবে শীতাংশু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ কিছু বলল না। ক্ষণিকের জন্য দুজনের এই যুগ্ম উপস্থিতিই যেন শুধু বাঙ্ময় হয়ে রইল। তারপর দোর ভেজিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল কুন্তলা। শীতাংশু কান পেতে রইল। লঘু পায়ের শব্দ বাইরের টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দের মধ্যে মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধ'রে জেগে জেগে সেই বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগল শীতাংশু। তারপর কখন দুচোখ ভেঙে এল ঘুমে।

খুব ভোরেই যাত্রার আয়োজন সুরু করতে হোল। মুখ হাত ধুয়ে শীতাংশু আবার পরল সেই খাকির হাফপ্যান্ট। কিন্তু প্যান্টটির

রুক্ষতা যেন আর টের পাওয়া যাচ্ছেনা। শীতাংশুর সর্বাঙ্গে মনে কালকের সন্ধ্যার আর রাত্রের সেই আদর যত্নটুকু যেন স্নিগ্ধ চন্দনের প্রলেপের মত লেগে রয়েছে। দুটি নারকেল নাড়ুর সঙ্গে এক কাপ চা এনে দিল কুন্তলা। তাড়াতাড়িতে কোনো খাবার খেয়ে যাওয়ার সুবিধা হবে না বলে সুরলক্ষ্মীর নির্দেশে একটি পুঁটলিতে করে কিছু চিড়া আর গুড় সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে কুন্তলা বেঁধে দিয়ে এল। চুনু টুনু পায়ের ওপর কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল শীতাংশুকে। কুন্তলা নিচু হয়ে পায়ের ধূলো নিল। শীতাংশু স্নেহে চুনু টুনুর গাল টিপে দিয়ে স্মিতমুখে কুন্তলার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল তার চোখ দুটি ছল ছল করছে। শীতাংশুর বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু এ যেন কেবল বেদনা নয়, তার সঙ্গে এক অনাস্বাদিত আনন্দও যেন মিশে রয়েছে। শীতাংশু কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ আঁতুড়ের ভিতর থেকে সুরলক্ষ্মী অনুচ্চ, মিষ্টি কণ্ঠে ডাকলেন, 'শীতাংশু, চলে গেলে নাকি বাবা।'

শীতাংশু লজ্জিতকণ্ঠে বলল, 'না মাঐমা, আসছি।'

মনে পড়ল সুরলক্ষ্মীকে প্রণাম না জানিয়ে, তাঁর কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে তাড়াতাড়ি ভুল করে সত্যিই সে চলে যাচ্ছিল। ছি ছি ছি, নিজেকে শীতাংশু একটু তিরস্কার না করে পারল না। তারপর তাড়াতাড়ি আঁতুড় ঘরের দোরে এসে দাঁড়াল।

ছেলেকে বোধ হয় স্তন্য দিচ্ছিলেন সুরলক্ষ্মী, তাড়াতাড়ি একটু সংযত হয়ে বসলেন। কোলের ওপর শিশু আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শীতাংশু চেয়ে চেয়ে দেখল ভারি সুন্দর চেহারা হয়েছে সুরলক্ষ্মীর

এই ছেলের। চমৎকার চোখমুখের গড়ন, আর মোমের মত ফুটফুটে রঙ। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে ভোরের সোনালী রোদ এসে পড়েছে ওর গায়ে, খানিকটা রোদ লেগেছে সুরলক্ষ্মীর মুখে। শীতাংশু চৌকাঠে মাথা রেখে প্রণাম করল।

সুরলক্ষ্মী সস্নেহে বললেন, 'বেঁচে থাক বাবা বেঁচে থাক।'

সদানন্দও সঙ্গে সঙ্গে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে সুরলক্ষ্মী বললেন, 'শীতাংশুকে বলেছিলে কথাটা?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'না, তুমিই তো বলবে বললে।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'বেশ বলছি, শীতাংশুর কাছে আবার লজ্জা।'

শীতাংশু বলল, 'ব্যাপার কি মাঐমা।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'ওই সেই তিন বিঘা জমির কথা শীতাংশু। বরাদ্দের চেয়ে ওই ক'টুকরো জমিতে নাকি উনি বেশি বুনিয়েছেন। শুনেই আমি কিন্তু বলেছিলাম তা বুনিয়েছ বুনিয়েছ, আমাদের শীতাংশু থাকতে আর ভাবনা কি। ওকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এসো, দেখি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন করে না বলতে পারে।'

সুরলক্ষ্মী একটু থামলেন কিন্তু শীতাংশু কোন জবাব দিলনা দেখে তেমনি স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'উনি অবশ্য বলেছিলেন অনেক টাকাপয়সার ব্যাপার। এর জন্য বহু খরচপত্র করতে হয়। কিন্তু শীতাংশু, কি দিয়ে খাই না খাই, কোথায় শুই, কি করে থাকি সবই তো নিজের চোখে দেখলে বাবা, তুমিই বল খরচপাতির জন্য টাকা দেওয়ার কি সাধ্য আছে আমাদের?'

শীতাংশুর বুকের ভিতরটা আর একবার মোচড় দিয়ে উঠল। এবার আর আনন্দের কোন অনুভূতি নেই। হিংস্র বিষাক্ত একটা বল্লম কেউ যেন তার বুকে ছুঁড়ে মেরেছে।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে ম্লান একটু হাসল শীতাংশু, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'সেজন্য ভাববেন না মাঐমা। সব ঠিক করে নেব। টাকার চেয়ে বেশিই আপনারা দিয়েছেন। এত আর কোথাও পাইনি।' মনে মনে বলল, 'এমন করে হারাবার দুর্ভাগ্যই কি আর কখনো হয়েছে।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'বাঁচালে বাবা, এমন ভাবনা হয়েছিল আমার।'

সাইকেলে উঠবার আগে কুন্তলার দিকে আর একবার তাকাল শীতাংশু। মনে হোল তার চোখে আর জল নেই, ঠোঁটের কোণে কৃতার্থতার হাসি ফুটে উঠেছে।

দ্রুত প্যাডেল করে গাঁ ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল শীতাংশু। সবুজ কচিকচি পাটের পাতা হাওয়ায় দুলছে। কুন্তলার সেই পুরোণ ফিকে হয়ে যাওয়া সবুজ রঙের শাড়িখানা যেন আর একবার শীতাংশুর চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু তারপরই শীতাংশু মনে মনে অদ্ভুত একটু হাসল। হয়তো এরই মধ্যে আছে সদানন্দ গাঙ্গুলীর বরাদ্দের বাড়তি সেই তিন বিঘা জমি!

রাতের সেই টিপটিপে বৃষ্টি আর নেই। নীল নির্মল আকাশে ভোরের সেই সোনালী স্নিগ্ধতা মেঘান্তরিত খররৌদ্রে দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

পতাকা

উদ্যোগ আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচির একটা ছক কেটে রেখেছেন শচীবিলাস। গাঁয়ের নানা বয়সী উৎসাহী ছেলেদের আনাগোনার বিরাম নেই। ঝাঁড় থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে লম্বা এবং সবচেয়ে সোজা একটি তল্লা বাঁশ কেটে আনা হয়েছে। নমঃশূদ্র পাড়ার গগন ঘরামি তার ধারাল দা নিয়ে নিখুঁতভাবে ছোট ছোট গিঁটগুলি চেঁছে সমান করে দিয়েছে বাঁশটির। শচীবিলাস একবার তাঁর আঙুলের শীর্ণ ডগাগুলি বুলিয়ে নিলেন তার ওপর। মুখে একটা প্রসন্ন পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল।

কিন্তু কেবল মুখের ভাবে নয় প্রশংসাটা ওঁর মুখের ভাষায় শুনতে চায় গগন, 'ঠিক হয়নি ছোট কর্তা ?'

শচীবিলাস মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, 'বেশ হয়েছে। পাকা হাত তোমার গগন। ঠিক হবেনা কেন। তোমার হাতে বড়া বাঁশের বড় বড় গিঁটগুলি পর্যন্ত তেলের মত পালিশ হয়ে যায়, আর এতো সামান্য একটা তল্লা বাঁশ।'

গগন তাড়াতাড়ি জিভ কেটে মাথা নিচু ক'রে নিজের হাতে চাঁছা বাঁশটির ওপর কপাল ছোঁয়াল। তারপর শচীবিলাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ্ঞে একি বললেন ছোট কর্তা। একি ঘর গেরস্থালীর কোন কাজে লাগতে যাচ্ছে যে সামান্য বলছেন। এতে যে স্বাধীনতার নিশান উড়বে। বাঁশ বলতে মধু বাবুরা তো আমাকে ধরবেই

দিলেন। বললেন 'বাঁশ নয় ঘরামি, বাঁশ নয়, পতাকা দণ্ড।'

শচীবিলাস স্নিগ্ধ একটু হাসলেন, 'বেশ তাই বল।'

সাদা ধবধবে একখণ্ড খদ্দরের কাপড়ে সযত্নে রঙীন তুলি বুলিয়ে দিল নীলকমল পাল। মাঝখানে সাদা জমির ওপর এঁকে দিল চরকা, দুই পাশে হরিত হলুদের ঢেউ। তারপর তুলি রেখে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন হয়েছে ছোট কর্তা?' শচীবিলাস স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'বেশ হয়েছে নীলকমল, চমৎকার হয়েছে।'

ছোট্ট একটি কাঁচের গ্লাস শচীবিলাসের মুখের সামনে প্রায় এগিয়ে ধরল ইন্দিরা, 'ওষুধটা এবার খেয়ে নিন বাবা।'

শচীবিলাস একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার ওষুধ!' কিন্তু পরমুহূর্তেই বিরক্তি দমন করে মেয়ের হাত থেকে ওষুধের গ্লাসটা তুলে নিলেন শচীবিলাস। চুমুক দেওয়ার আগে সস্নেহে একবার তাকালেন মেয়ের দিকে, কোমল কণ্ঠে বললেন, 'এক দিন কিন্তু ওষুধ না খেয়েও আমি ভাল থাকতাম ইন্দু।'

ইন্দিরা বলল, 'না না ওষুধটা খান।'

ওষুধ খেয়ে খালি গ্লাসটা মেয়ের হাতে ফিরিয়ে দিলেন শচীবিলাস। তাঁর মুখখানা একটু যেন ক্লিষ্ট, একটু যেন কঠিন দেখাল। হয়তো তা কেবল কটু স্বাদ ওষুধের জন্যই নয়। ইন্দিরার কণ্ঠে তেমনি শাসনের ভঙ্গি, আবদারের মাধুর্য আজো তেমনি আছে। তবু কি যেন নেই। তার সম্বোধনে, তার আহ্বানে সমস্ত হৃদয় মন যেন আজকাল আর ঠিক আগের মত সাড়া দিয়ে ওঠেনা শচীবিলাসের। মাঝে মাঝে সংশয় হয়। প্রশ্ন করেন নিজেকে দৈন্যটা কার। কার্পণ্য

কোথায়। তা কি ইন্দিরার কণ্ঠে, না শচীবিলাসের অন্তরে? রাজনৈতিক আদর্শে, কর্মপদ্ধতিতে প্রভেদটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠেছে মেয়ের সঙ্গে। মিলের চেয়ে অমিলই হয় বেশী। কথায় কথায় তর্ক বাঁধে। বার বার দুজনেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকে। তারপর ইন্দিরা হঠাৎ এক সময় উঠে গিয়ে নিয়ে আসে ওষুধের গ্লাস, কি চায়ের কাপ, কি তেলের বাটি। শচীবিলাস সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে যান। একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'আজকাল আমি বুঝি খুব রূঢ়ভাষী হয়ে উঠেছি ইন্দু।'

ইন্দিরার মুখখানা একটু যেন আরক্ত হয়ে ওঠে. তারপর দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, 'না, বাবা, সত্যিই আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে।' কিংবা 'রোজই তো এই সময় আপনি চা খান বাবা।' 'বেলা যে একেবারে গড়িয়ে গেছে। এর পর চান করলে যে শরীর আপনার আরো খারাপ হবে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন শচীবিলাস। ইন্দিরা মিথ্যা বলেনি, সময় ভুল হয়নি তার। তবে কি শচীবিলাসেরই ভুল? না ইন্দিরার এই অভ্রান্ত সময়-জ্ঞানের মধ্যেই অশ্রদ্ধা, অসহিষ্ণুতা আন্তরিক সৌহার্দ্যের অভাব মিলে রয়েছে? রাজনীতি আর হৃদয়নীতি। কিন্তু শচীবিলাসের রাজনীতি তো কেবল মস্তিষ্কে নয়, জ্ঞান মাত্র নয়, তা তাঁর হৃদয়ের অনুভূতির স্তরে স্তরে মিশে রয়েছে। শচীবিলাসের রাজনীতি মানে দেশ সেবা। বিজ্ঞান নয়, ধর্ম। সূক্ষ্ম চারুশিল্প। কল্পনার রঙে, অন্তরের রসে বার বার তা তাঁর চোখের সামনে মূর্তি ধরে ওঠে। তিনি জোর করে স্বীকার করেন, 'হ্যাঁ, আমি পৌত্তলিক।'

ইন্দিরা হাসে, 'এক হিসাবে তা ঠিক, দেশ আপনাদের কাছে প্রতিমা, দেশের লোক আপনাদের কাছে পুতুল। ভাবেন, তাদের ইচ্ছামত ভাঙা যায় গড়া যায়। গায়ে তাদের রঙ লাগান আর অপছন্দ হলে মুছে ফেলেন। বলেন ভুল হয়েছে।'

ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকাল শচীবিলাস। তিন বছর বয়সের মা-মরা মেয়ে ইন্দিরা। কিছুতেই কোলছাড়া হতে চাইত না। বকে, ধমকে, কাঁদিয়ে ওর পিসীর কোলে দিয়ে তবে শচীবিলাস বেরুতে পারতেন। আজ তার শোধ নিচ্ছে ইন্দিরা। তার ভাষায় আজ আর আবদার নেই, অভিমান নেই, আছে কেবল শ্লেষ আর ব্যঙ্গ। তাই ওষুধ খাওয়াবার দিকে ইন্দিরার লক্ষ্য আছে, যত্ন আছে, কিন্তু ওষুধ ছাড়াও যে শচীবিলাস সত্যি সত্যি আজকের দিনে ভাল থাকতে পারেন—এতে ইন্দিরার বিশ্বাস নেই। এই উচ্ছ্বাস হয়তো তার কাছে উপহাসের বস্তু।

মহকুমা সহর থেকে শচীবিলাসের জন কয়েক কংগ্রেস কর্মী সহযোগী বন্ধু এই উপলক্ষ্যে আজই সন্ধ্যায় এসে পৌঁছুবেন। এর আগের দু'তিন বছর শচীবিলাসকেই তাঁরা আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন সহরে। তিনি সেখানে সভাপতিত্ব করেছেন, তুলে ধরেছেন জাতীয় পতাকা। কিন্তু এবার ডাক্তাররা নিষেধ করেছেন। ইদানীং ব্লাড প্রেসারটা বড় বেশী বেড়ে উঠেছে শচীবিলাসের। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে হৃদযন্ত্র। এ সময় পঁচিশ মাইল রাস্তা মোটরে যাওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই সমীচীন হবে না। আর যে রকম পথ ঘাটের অবস্থা। চিকিৎসকদের শাসন হয়তো গ্রাহ্য করতেন না শচীবিলাস,

কিন্তু গাঁয়ের লোকের অনুরোধ তিনি এড়াতে পারলেন না। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এবার তাদের মধ্যেই থাকতে হবে তাঁকে। এর আগে পর পর কয়েক বছর তিনি দেশে থাকতে পারেন নি। কখনো জেলে, কখনো বা অন্য কোন জেলায় এদিনটি তাঁকে কাটাতে হয়েছে। এত দিন বাদে নিজের গ্রামবাসীদের মধ্যে যখন এসেই পড়েছেন শচীবিলাস তখন তাদের নিয়েই এবারকার উৎসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হোক। সমগ্র দেশের গৌরব শচীবিলাস, কিন্তু এই গাঁয়ের একান্ত আপন জন। একথা যেন ভুলে যান না তিনি। শচীবিলাস ভোলেননি, সানন্দে সম্মত হয়েছেন।

'নীরদ বাবুরা বোধ হয় সন্ধ্যাসন্ধি এসে পৌঁছবেন। বৈঠকখানাটা ভালো করে ধোয়ামোছা হয়েছে তো ইন্দু? রান্নাঘরে একটু খোঁজ-খবর নিয়ো বউঠান কি করছেন না করছেন।'

দূর সম্পর্কিত এক জেঠতুতো ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী অনেক দিন থরেই শচীবিলাসের সংসারে আশ্রয় নিয়েছেন। ইদানীং সকলে শচীবিলাসই তাঁর আশ্রয় নিয়েছেন বলা চলে। ঘর সংসারের সমস্ত ভারই তাঁর ওপর। রাজনৈতিক প্রোগ্রামে বাপ মেয়ে দুজনই যখন দীর্ঘ দিনের জন্য বাইরে চলে যান, চারুবালা একাই দু' একজন ঝি চাকরের সাহায্যে আগলে রাখেন বাড়ি ঘর। পিতাপুত্রীর কারোরই রাজনীতির ধার তিনি ধারেন না। নিজের ঘরকন্না নিয়েই মশগুল; অবসর সময় কাঁথা সেলাই করেন, আসন বোনেন কিংবা সুর করে পয়ার ছন্দে বসে বসে পড়েন রামায়ণ, মহাভারত আর চৈতন্য-চরিতামৃত।

কি একটা কাজে এ ঘরে এসেছিলেন চারুবালা। দেবরের কথা কানে যেতে বললেন, 'স্বদেশী বন্ধুদের বুঝি স্বদেশী হাতের রান্না ছাড়া চলবে না ঠাকুরপো? তাই বউঠানে বিশ্বাস নেই, দেশোদ্ধারিণী মেয়েকে পাঠাচ্ছ রাঁধতে।'

শচীবিলাস বললেন, 'কি যে বলছ বউঠান, ইন্দু আবার বাঁধতে পারে নাকি, তোমাকে জোগান দেওয়ার জন্য পাঠাচ্ছিলাম।'

চারুবালা প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'কথা শোনো। রাঁধতে আবার কোন্ মেয়ে না পারে? আমাদের আমলে মেয়েরা কেবল রাঁধত আর চুল বাঁধত, আর একালের মেয়েরা তার বদলে না হয় রাঁধে আর দল বাঁধে। এমন কোন কাজ নেই যা ইন্দু না জানে। আজকের সব রান্না ওকে দিয়ে আমি রাঁধাব দেখে নিয়ো।'

ইন্দিরার রান্না শচীবিলাসের একেবারে অনাস্বাদিত নয়। কাছে থাকলে দু' একটা তরকারি প্রায়ই তাঁর জন্য সে রেঁধে দেয়। খেতে ভালোই লাগে শচীবিলাসের। কিন্তু মুখে তা তিনি স্বীকার করেন না। আজও করলেন না, 'তা রাঁধাতে চাও রাঁধাও। কিন্তু নুনের বৈয়ম আর লঙ্কার গুড়োর কৌটোটা একটু দূরে সরিয়ে রেখো বউঠান। মেয়েব কথার মধ্যে নুন ঝালের পরিমাণ এত বেশী যে ঝোলে তার কিছু কম পড়লেও এসে যাবে না।'

শচীবিলাসের বন্ধুদের সঙ্গেও ইন্দিরা অসংকোচে, কুণ্ঠাহীন ভাবে বিতর্ক চালায়, তাঁদের রাজনৈতিক মতামতের ওপর ইন্দিরা যে তেমন শ্রদ্ধা পোষণ করে না তা চারুবালাও লক্ষ্য করেছেন। ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগে না। শত হলেও তাঁরা ইন্দিরার বাপের

বয়সী, অনেকে ইন্দিরার বাবার চেয়েও বেশী নাম করা লোক। কতবার জেল খেটেছেন দেশের জন্ত। নিজের বাবার সঙ্গে যাই করুক .বাইরের ওই সব প্রবীণ ভদ্রলোকদের সঙ্গে ইন্দিরার মত একুশ বাইশ বছরের একটি মেয়ের অমন অসহিষ্ণু উত্তেজিত আলোচনা করা চারুবালার চোখে বিসদৃশই লেগেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ইন্দিরার অপ্রতিভ আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মায়া হোল চারুবালার। শচীবিলাসের কথার জবাবে বললেন, 'কিন্তু সারা গায়ে তোমাদের নিশ্চয়ই কাটা ঘা আছে ঠাকুরপো। না হলে নুন ঝালের ছিটাকে অত ভয় কেন? আয় ইন্দু, তোর চুল বেঁধে দি। চুলগুলিকে কেমন বাবুইর বাসা করে রেখেছে দেখ। আচ্ছা মেয়ে হয়েছিস যাহোক।'

ইন্দিরাকে নিয়ে বাড়ির ভিতরের দিকে চলে গেলেন চারুবালা। শচীবিলাসের মনে হোল এমন স্নেহের ভঙ্গিতে, এমন আদর করে আজকাল তিনিও তো আর মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন না। কেবল ইন্দিরার দোষ দিলেই বা চলবে কেন। তিনিই কি তেমন ভাবে বুঝে দেখতে চেষ্টা করেন ইন্দিরার যুক্তি, ইন্দিরার বক্তব্য? শুনতে না শুনতে তিনিও কি ইন্দিরার মতই উত্যক্ত আর অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন না? দলগত মতভেদ কি এতই দুরতিক্রম্য যে বাপ মেয়ের সম্পর্ককেও তা স্পর্শ করে? তরুণ তরুণীর পরস্পরের প্রতি দুটি অনুরক্ত হৃদয়কেও বিচ্ছিন্ন করে দেয়?

নিরুপমের কথা মনে পড়ল শচীবিলাসের। সামান্ত মতানৈক্যের জন্ত নিরুপমকে ইন্দিরা প্রত্যাখ্যান করেছে। নিরুপমও সমস্ত

সংস্পর্শ ত্যাগ করেছে ইন্দিরার সঙ্গে, কিন্তু নিরুপমও তো বামপন্থী। সেও তো বিপ্লববাদী। ত্যাগ স্বীকার দেশের জন্য সেও তো করেছে। তবু তাকে সহ্য করতে পারেনি ইন্দিরা। অত্যন্ত অনায়াসে তার প্রেমকে সে অস্বীকার করেছে। একদিন শচীবিলাসও তো বামপন্থী ছিলেন, চরমপন্থী ছিলেন তাঁর আমলে। ফাঁসী যেতে যেতে ফিরে এসেছেন। কিন্তু রাজনীতিতে কাল যা বাম আজ তা দক্ষিণ। ডাইনে বাঁয়ে মুহূর্তে তা পাশ বদলায়। আর বদলায় মন। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প সঙ্গে সঙ্গে বদলে চলে। এ যুগের রাজনীতি সর্বগ্রাসী। হতেই হবে। কারণ তা জীবননীতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন।

সন্ধ্যার পর মোটরে করে শচীবিলাসের বন্ধুরা এসে পৌছলেন। প্রত্যেকেই এতদঞ্চলের প্রখ্যাত কংগ্রেস কর্মী। এদের অনেকের সঙ্গেই শচীবিলাস একত্র কাজ করেছেন, জেল খেটেছেন একসঙ্গে। মোটরের ধুলো উড়ে এসে লেগেছে ওদের জামা কাপড়ে। চশমার কাঁচে পুরু হয়ে ধুলোর পর্দা পড়েছে। শচীবিলাস নিজের হাতে ঝেড়ে দিলেন বন্ধুদের কাপড়ের ধুলো। ইন্দিরা ট্রেতে করে কাপ আর চায়ের কেটলি নিয়ে এল সাজিয়ে।

শরীরের প্রতি তেমন লক্ষ্য রাখছেন না বলে শচীবিলাসকে অনুযোগ করলেন বন্ধুরা। সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ জানালেন কালকের প্রোগ্রামটা একটু সকাল সকাল সেরে ফেলতে। আরো কয়েকটি জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ভার পড়েছে তাঁদের ওপর। এ যাত্রা এখানে বেশীক্ষণ দেরী করলে লোকে অতিরিক্ত বন্ধুবাৎসল্যের অপবাদ দেবে।

শচীবিলাস হেসে বললেন, 'মাভৈঃ, এখানকার অনুষ্ঠান সূর্যোদয়ের আগেই না হয় শেষ করা যাবে।'

বন্ধুদের জন্য প্রোগ্রামটা সামান্য একটু অদল বদল করলেন শচীবিলাস। পূবের আকাশে রক্তবর্ণ সূর্য যখন গোল হয়ে দেখা দেবে মাঠের মত বিস্তৃত সেখেদের চটান জায়গাটায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবে এ গাঁয়ের। সংকল্প বাক্য পাঠ এবং আনুষঙ্গিক বক্তৃতার পর অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করবে। ছেলেদের হাতে থাকবে পাকাটির ডগায় ছোট ছোট জাতীয় পতাকা। ঠিক যেমন এ গাঁয়ের বার্ষিক নগর সংকীর্তনের সময় থাকে। মেয়েদের হাতে থাকবে শঙ্খ। সকলের হাতে হয়তো শঙ্খ দেওয়া সম্ভব হবে না, অত শঙ্খ গাঁয়ে নেই। কিন্তু মুখে মুখে হুলুধ্বনি তো প্রত্যেকেই দিতে পারবে। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গৃহস্থ বধূরা কিশোর কিশোরীদের এই শোভাযাত্রা আধো ঘোমটার আড়াল থেকে চেয়ে দেখবে। বারকোষ থেকে কেউবা ছিটাবে ফুল, কেউবা পিতলের থালা থেকে খেজুর পাটালির টুকরো ছিটিয়ে দেবে। ছেলে মেয়েরা কুড়িয়ে কুড়িয়ে মুখে পুরবে আর সুমিষ্টস্বরে বলে উঠবে 'বন্দেমাতরম্'। নিজের পরিকল্পনায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে যান শচীবিলাস। তারপর বিকালের দিকে সভা বসবে সমস্ত গাঁয়ের। আবৃত্তি হবে, সঙ্গীত হবে, গাঁয়ের ভাষায় বক্তৃতা করবে গগন ঘরামি আর নীলকমল পালের দল। সহযোগী বন্ধুদের তিনি ততক্ষণ ধরে রাখবেন না। রাত্রে জাতীয় দেশাত্মবোধমূলক

অভিনয় করবে ছেলেরা। তাঁর উঠানে সেজন্য থিয়েটার মঞ্চ আগে থেকেই তারা তৈরী করে রেখেছে।

বন্ধুদের ডেকে সগ্ন তৈরী জাতীয় পতাকাটা দেখিয়ে আনলেন শচীবিলাস। সবুজ কাঁচা বাঁশের সঙ্গে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত খদ্দরের কাপড় মজবুত সুতোয় গেঁথে দেওয়া হয়েছে। একেবারে গাঁয়ের প্রথায় তৈরী নিশান। বন্ধুরা সবাই প্রশংসা করলেন, চমৎকার হয়েছে। সত্যিই—রুচি আছে শচীবিলাসের।

অনেক রাত্রে শুয়েও রাত্রে শচীবিলাসের বহুবার ঘুম ভেঙে গেল। শেষের দিকে একটু তন্দ্রার মত এসেছে কি একটা গোলমালে শচীবিলাস চমকে উঠলেন। ব্যাপার কি, কান খাড়া করে শুনলেন কিন্তু কথাবার্তার মর্ম যেন সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেন না। পাড়ার ছেলেদের গলা। সবাই তাঁর উঠানে এসে জড়ো হয়েছে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করছে। ফলে তাদের উত্তেজনাটাই বোঝা যাচ্ছে, কথা বোঝা যাচ্ছে না।

শচীবিলাস বিছানা ছেড়ে নেমে এলেন উঠানে, 'কি হয়েছে বিনয়, সবাই একসঙ্গে চেঁচিওনা, যে কেউ একজন এসে বোলো।'

বিনয়ই এগিয়ে এল, 'মকবুলরা বলছে তাদের চটানে আমাদের জাতীয় পতাকা তুলতে দেবেনা। আমরা যে সামিয়ানা টানিয়েছিলাম রাত্রে এসে তারা তা খুলে ফেলেছে। ছেলেরা ভোর হতে না হতেই এম, ই, স্কুল থেকে চেয়ার বেঞ্চগুলি মিটিং-এর জায়গায় টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখ আর সিকদার বাড়ির লোক এসে বাধা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। চেয়ার টেবিল তারা পাততে দেবে না ওখানে।

কিছুতেই নাকি মিটিং হতে দেবে না। আপনি একবার হুকুম দিন জেঠামশাই, দেখি ওরা কেমন করে না দিয়ে পারে।'

অতুল বলল, 'কেবল সেখ আর সিকদাররাই হবে কেন, চরকান্দির সমস্ত মুসলমানই এসে জড়ো হয়েছে ওখানে। পীরপুরের সেই বুড়ো মৌলবীকেও দেখলাম। বোধ হয় তারই কারসাজি এসব, কুবুদ্ধি দিয়ে রাতারাতি সকলের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

শচীবিলাস স্তব্ধ হয়ে রইলেন। একি বিভ্রাট, এমনভাবে বাধা আসবে এ যে তিনি কল্পনায়ও আনতে পারেন নি।

পিছনে পিছনে ইন্দিরাও এসে দাঁড়িয়েছিল। অতুলের কথায় হেসে বলল, 'তুমি ভুল করছ অতুলদা। একজনের কুবুদ্ধিতে রাতা-রাতি গাঁ শুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরতে পারে না। মাথা আর মুখ ওদের ঘুরেই ছিল।'

অতুল রুক্ষকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল, 'ঘুরেই ছিল? তোমাকে ওরা আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছে বুঝি ইন্দিরা?'

ইন্দিরা বলল, 'না অতুল দা তোমাদের মত ওরাও অতখানি বিশ্বাস আমাদের করতে চায় না। আমাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলে হয়তো ব্যাপারটা অন্য রকম হোত।'

শচীবিলাস ধমক দিয়ে উঠলেন, 'কি হোত না হোত সে কথা এখন থাক, কি হবে এই মুহূর্তে সেই কথাই ভাবো।'

শচীবিলাসের বন্ধুরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপারটা সব শুনে তাঁরাও হঠাৎ কিছু বলতে পারলেন না। কোন একটা মীমাংসায় আসতেই হবে। কিন্তু পথটা কি।

অতুল আর বিনয়ের দল ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। গুণ্ডা প্রকৃতির মুসলমানদের বাধা তারা মানবে না। ওখানেই আজ উঠবে দেশের জাতীয় পতাকা। এ পতাকা কোন সম্প্রদায়ের নয়, সমগ্র দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। ওরা ভুল করছে বলে সে ভুলকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। সে ভুলকে জোর করে ভাঙতে হবে।

কিন্তু শচীবিলাস অত সহজে মন স্থির করতে পারলেন না। কলকাতা আর নোয়াখালীর দাঙ্গার সময় গ্রামের হিন্দু মুসলমানের চাঞ্চল্য তিনি লক্ষ্য করছেন। মুসলমান যুবকেরা হিন্দুদের লক্ষ্য করে নানা রকম বক্রোক্তি করেছে। আস্ফালন করেছে আড়ালে আবডালে। হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছে, গোপনে গোপনে আত্মরক্ষার জন্য তৈরী হতে চেষ্টা করেছে। আর যাঁরা সম্পন্ন ধনী গৃহস্থ তাঁরা দালানে তালাচাবি দিয়ে গৃহলক্ষ্মী আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে নেপালী দারোয়ান পাহারায় রেখে সাময়িক ভাবে দেশ ত্যাগ করেছেন। এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে যখন শচীবিলাসের মনে হয়েছে দাঙ্গার সংক্রামক মহামারী থেকে এ গাঁকেও রক্ষা করা গেল না। হিন্দু মুসলমানের মারাত্মক হানাহানি এখানেও বেঁধে উঠল বলে। কিন্তু তিনি আর ইন্দিরা রাত দিন সতর্ক রয়েছেন। একবার গেছেন হিন্দুদের পাড়ায় আর একবার ঘুরেছেন মুসলমানদের বাড়িতে বাড়িতে। এক হাতে থামিয়েছেন ভীত পলায়নপর হিন্দুদের আর এক হাতে উত্তেজিত মুসলমান জনসাধারণের হাত ধরেছেন। যে জন্যই হোক দাঙ্গা শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলে লাগেনি। মারাত্মক সময়টা নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়েছে। যারা গ্রাম ছেড়ে

পালিয়ে ছিল তারা ফের ফিরে আসতে সুরু করেছে। কৌতুকে কৌতূহলে ক্ষোভে আর আক্রোশে যে সব মুসলমান যুবক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তারা ফের শান্ত হয়ে গৃহস্থালিতে মন দিয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা দিবসকে উপলক্ষ্য করে আবার হঠাৎ একি বিভ্রাট এলো। সংঘাতের আবার এ কোন সূচনা দেখা দিল আজ। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইলেন শচীবিলাস। তারপব ছেলেব দলকে বললেন, 'আচ্ছা চল, দেখি গিয়ে ওরা কি চায়।'

বিনয়েব দল জাতীয় পতাকাটা সঙ্গে নিয়ে আসতে যাচ্ছিল, শচীবিলাস বাধা দিয়ে বললেন, 'ওটা রেখেই এসো বিনয়। আগে দেখি ওদের উদ্দেশ্যটা কি।'

বিনয় আর অতুলরা অসন্তুষ্ট ভাবে শচীবিলাসেব অনুসবণ করল। তাঁব বন্ধুদেব মধ্যেও যে কেউ কেউ খুসি হলেন না সে কথা শচীবিলাস বুঝতে পাবলেন।

শচীবিলাসেব বাড়ির নিচেই বড় একটা চটান। ওপাবে মুসলমান পাড়া। সেখেদের বাড়ির বসিব ছিল শচীবিলাসের দোস্ত। তাঁর কাছ থেকেই তিনি জায়গাটুকুর খানিকটা অংশ কিনে বেখেছিলেন। ইচ্ছা ছিল সমস্তটুকুই কিনবেন। কিন্তু বসির সেখ ছাড়েনি। বলেছে, 'অত লোভ কেন দোস্ত। ঘোর-দৌড় দেখতে গিয়ে ছেলেবেলায় কতবার মামা-বাড়িতে এক কাঁথার তলে দুজনে রাত কাটিয়েছি মনে পড়ে? আর একখানা জমি দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে ভোগ করতে পারব না? ভোরে উঠেই তোমাকে একেবারে মুসলমানের জমিতে পা দিতে হয়, ঠাকরুণরা কাঁথা কাপড় মেলবার জায়গা পান

না, এই জন্যই অর্ধেকটা বেচে দিলাম তোমাকে। নইলে জমি বেচবার তো আমার দরকার ছিলনা। ভয় নেই সীমানা নিয়ে মামলা মোকদ্দমা করতে যাবনা তোমার সঙ্গে।'

শচীবিলাস বলেছিলেন, 'আমরা না হয় কাজিয়া মোকদ্দমা না বাধালাম কিন্তু আমাদের ছেলেরা? তারা যদি বাধায়?'

হেসে দাড়িতে হাত বুলিয়েছিল বসির সেখ, 'তারা যদি বাধায় তার মজাও তারাই ভোগ করবে। তুমি আমি সেজন্য ভেবে মরি কেন দোস্ত।'

বসির সেখকে বেশিদিন ভাবতে হয়নি। অল্পবয়সেই সে চোখ বুজেছিল। কিন্তু এত দিনে ভাববার পালা এসেছে শচীবিলাসেব।

বসিরের ছেলে মকবুল আর মনসুরও কোন দিন তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ বাধায় নি। কাকা বলে ডেকেছে, সমীহ করে চলেছে সব সময়। বর্গা চষেছে তাঁর ক্ষেতের। পাটের যখন দর ছিল এই চটানটুকুতেও তারা পাট বুনেছে। ধুয়ে শুকিয়ে ভাগের ভাগ বুঝিয়ে দিয়ে গেছে শচীবিলাসকে। ইদানীং ফসল না হওয়ায় জায়গাটা খালিই পড়ে থাকে। গরু ছাগলে চরে, পাড়ার ছেলেরা খেলা ধুলা করে। আর বছর বছর গাঁয়ের লোক স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের দিনে জাতীয় পতাকা তুলতে আসে এখানে। কয়েক বছর শচীবিলাসও নিজের হাতে তুলেছেন। মকবুল মনসুররা জায়গা নিয়ে কোন আপত্তি করেনি, বরং তারা এসে সমান ভাবে কামলা খেটেছে, দুর্বাঘাসের ওপর বসে শচীবিলাসের বক্তৃতা শুনেছে, তাদের বউ-ঝিরা বেরিয়ে এসে গাছ গাছালির আড়াল থেকে ঘোমটা

তুলে রঙ্গ দেখেছে ছোটকর্তার। এত দিনের মধ্যে কোনদিন কোন আপত্তি ওঠেনি, কোন নালিস অভিযোগ আসেনি কোন পক্ষ থেকে। আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্পে সমস্ত কিছু কলুষিত হয়ে উঠেছে। সম্মান নেই, শ্রদ্ধা নেই, সৌহার্দ্য নেই। শচীবিলাসের সমস্ত অন্তর বেদনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

চটানের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে মুসলমান জনতা ভিড় করে রয়েছে। উত্তেজিত ভাবে তারা কি যেন বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে। শচীবিলাস এগিয়ে গেলেন সেখানে। ডাকলেন, 'মকবুল, মনসুর, এদিকে এসো।'

পিছন থেকে কয়েকটি মুসলমান ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, 'মকবুল মনসুর নয়,' মকবুল মিঞা মনসুর মিঞা।' শচীবিলাস ম্লান একটু হাসলেন, 'আচ্ছা তাই হবে, মকবুল মিঞা এদিকে একবার আসুন।'

মকবুল এসে জোড়হাত করে দাঁড়াল, 'মাফ করবেন কাকা বাবু। ওই ফাজিল ছোকরাদের কথায় কান দেবেন না। মিঞা কেন, আমাকে শুধু মকবুল বলেই ডাকুন। আমি আপনার ছেলের মত।'

শচীবিলাস অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ছেলের মত এ কোন কাজটা করলে তুমি। বছর বছর ধরে এখানে আমরা জাতীয় পতাকা তুলছি আজ হঠাৎ তোমাদের আপত্তির কি কারণ ঘটল। আর আপত্তিই যদি ছিল আগে জানালে না কেন। কেন সামিয়ানা, আর চেয়ার টেবিলগুলি ছিঁড়ে ছুঁড়ে তছনছ করে দিলে।'

মকবুল বলল, 'আজ্ঞে সব ওই বদমাস ছোকরাদের কাণ্ড। ওরা ক্ষেপে গিয়েছে।'

শচীবিলাস চোখ গরম করে বললেন, 'আর ক্ষেপিয়ে তুলেছে তোমাদের ওই বদমাস মৌলবী।'

মুসলমানদের মধ্যে একটা হৈ চৈ শব্দ শোনা গেল। দু'হাত তুলে তাদের শান্ত হতে বলে মকবুল একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াল শচীবিলাসের সামনে, বলল 'মৌলবী নয় কাকাবাবু, মৌলবী সাহেব। তিনি এখানকার সালার সাহেব আমাদের, নেতা, আপনি যেমন হিন্দুদের।'

শচীবিলাস ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কেবল হিন্দুদের! আমি কি তোমাদেরও নই?'

মকবুল চুপ করে রইল।

শচীবিলাস আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ, কি বলেছেন তোমাদের মৌলবী সাহেব?'

মকবুল বলল, 'বলেছেন, ও নিশান আমাদের নয়। আমাদের নিশান চাঁদ-মার্কা লীগের নিশান। আপনাদের ওই তে-রঙা উড়তে দেখলে আমাদের গুণাহ্ হয়। ও নিশান এখানে আমরা উড়তে দিতে পারি না।'

শচীবিলাস প্রতিবাদ করে বললেন, 'মিথ্যা কথা। এ নিশান কেবল হিন্দুর নয়, হিন্দু মুসলমান সকলেরই। এ নিশান ভারতের একমাত্র জাতীয় পতাকা। একে অসম্মান কোরোনা মকবুল।'

কিন্তু সমস্ত মুসলমান জনতার কোলাহলে শচীবিলাসের কণ্ঠ ডুবে গেল। তাঁর শেষের দিকের কথাগুলি মোটেই শোনা গেল না।

হিন্দু যুবকের দল একদিকে রুখে দাঁড়াল আর একদিকে

মুসলমানেরা। সংখ্যায় তারাই বেশী। মুহূর্তে মুহূর্তে তাদের দল স্ফীত হতে লাগল। পিছনের দিকে লাঠি আর খেজুর গাছ কাটা ছ্যানি দেখা গেল কারো কারো হাতে। এখানে কিছুতেই তে-রঙা নিশান তারা ওড়াতে দেবে না।

বিনয় শচীবিলাসের কানের কাছে এসে বলল, 'অনুমতি করেন তো বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ছাড়ি গোটা কয়েক। ভয়ে ওরা পালিয়ে যেতে পথ পাবে না।'

শচীবিলাস মাথা নাড়লেন, 'না বিনয়, ওসব নয়।'

বিনয় বলল, 'তবে কি জাতীয় পতাকা এ গাঁয়ে উঠবে না আজ? প্রাণের ভয়ে আমরা পিছিয়ে যাব? অপমান করব জাতীয় পতাকার?'

শচীবিলাস বললেন, 'নিশ্চয়ই নয়। জাতীয় পতাকা আজ আমরা তুলবই এখানে।'

বন্ধুরা বললেন, 'কাজটা সমীচীন হবেনা শচী। ফের দাঙ্গা হাঙ্গামার কোন রকম সুযোগ দেওয়া উচিত নয় এখন। চল বরং অন্য স্থান দেখি, গাঁয়ে তো আরো অনেক জায়গা আছে।'

ইন্দিরা বলল, 'তা আছে। কিন্তু গাঁয়ের অনেক মানুষই তা হলে এখানে পড়ে থাকবে। স্বাধীনতা দিবসের উদ্‌যাপনে গাঁয়ের বেশীর ভাগ লোকেরই কোন অংশ থাকবে না।'

শচীবিলাস কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'তুমি তা হলে করতে চাও কি? ওদের ওই ভ্রান্ত ধারণার, অবুঝ আবদারের প্রশ্রয় দিতে চাও?'

ইন্দিরা বলল, 'আপাতত এক আধটু তো দিতেই হবে বাবা।

কেবল কি ধমকেই ফল হবে? আচ্ছা দেখি আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে।'

স্তব্ধ বিমূঢ় ভঙ্গিতে, শচীবিলাস দাঁড়িয়ে রইলেন। পতাকা উত্তোলনে ঠিক এ ধরণের বাধা তিনি কোন দিন পাননি। কতবাব পুলিশের হাতে মাব খেয়ে বক্তাক্ত হয়েছেন, পতাকার কাপড় তারা ছিঁড়ে ফেলেছে, দণ্ড ভেঙ্গেছে পিঠেব ওপব। কতবাব কাবাদণ্ড নিতে হয়েছে এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে। কিন্তু কোনবাব নিরুদ্যম হয়ে পড়েননি শচীবিলাস, নিরুৎসাহ হননি। দু'চাব দশজন পুলিস দেশেব স্বাধীনতাকে আটকে বাখতে পাববে না, তাদেব দু'চাব দশ হাজার অভিভাবকবাও নয়। কিন্তু আজ আইনেব বাধা নেই, পুলিসেব দল এসে পথ রুখে দাঁড়ায়নি। কিন্তু দাঁড়িয়েছে আব এক শ্রেণী। তাবা দু'চাব দশজন নয়, দু'চাব দশ হাজাবও নয়, অনেক অনেক বেশী। তারা পব নয়, নিতান্ত আপনাব জন, তাদের ফেলে দেওয়া যায় না, ছেঁটে দেওয়া যায় না, বাগে অভিমানে দূবে সবিয়ে বাখা যায় না তাদের। দেশের তারা অংশ, অঙ্গেব তাবা প্রত্যঙ্গ। অথচ তাবাই আজ পথেব বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাবাই ছিনিয়ে নিচ্ছে স্বাধীনতা পতাকা শচীবিলাসেব হাত থেকে। এব চেয়ে মর্মন্তুদ আব কি হতে পারে, এব চেয়ে বেশী যন্ত্রণাদায়ক?

ইন্দিবাকে নিজেদেব দলেব মধ্যে দেখে মুসলমানরা কৌতূহলী হয়ে উঠল। এই স্বদেশী মেমসাহেবটি তাদেব কাছে এক বিস্ময় আব কৌতূহলেব বস্তু। কখনো কখনো কৌতুকও তাবা বোধ কবে।

ইন্দিরা আর শচীবিলাস প্রায়ই দেশে থাকেন না। কিন্তু কলকাতা থেকে দেশে যখন ফেরেন সারা গাঁয়ে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। আর কোন হিন্দুর ঘরের মেয়ে এমন করে মাঠে ঘাটে ঘোরেয় না এ অঞ্চলে, বক্তৃতা করে না, দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে না সকলের সঙ্গে। কিন্তু ইন্দিরা সকলের মধ্যে ব্যতিক্রম। অত্যন্ত সাহস তার, সোমত্ত পুরুষদের প্রায় গা ঘেঁষে সে দাঁড়ায়। চোখে চোখ রেখে কথা কয়। সে কথার বেশীর ভাগই হয়তো বোঝা যায় না, কিন্তু শুনতে ভালো লাগে। ভারি মধুর ইন্দিরার বলবার ভঙ্গি। রক্তিম চমৎকার পাতলা দুটি ঠোঁট। তাকে দেখে লোভ হয় মকবুলের। কি যেন আছে এই মেয়ের মধ্যে। বহুদিনের পুরোন পীরপায়ের সেই পোড়ো মসজিদটার মত। বাইরে এখনো তার গায়ে চমৎকার সব কারুকার্যের চিহ্ন দেখা যায় কিন্তু ভিতরে যেতে সাহস হয় না। সেই পোড়ো মসজিদের ভিতরকার রহস্য দূরে দাঁড় করিয়ে রাখে কিন্তু অভ্যন্তরে টেনে নেয় না। ছোট কর্তার মেয়ে এই অপূর্ব খপসুরৎ ইন্দিরাও তেমনি।

খানিক বাদে ইন্দিরা ফিরে এল। মুখে তার বিজয়িনীর হাসি। সে জিতেছে। সন্ধি করতে পেরেছে, সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছে এই উন্মত্ত জনতার সঙ্গে। শচীবিলাসদের কাছে ফিরে এসে ইন্দিরা বলল, 'ওদের রাজী করিয়েছি। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ওরাও যোগ দেবে। আর এখানেই হবে সেই অনুষ্ঠান, অন্যত্র যেতে হবে না।'

শচীবিলাস সাগ্রহে বললেন, 'যোগ দেবে?'

শচীবিলাসের বন্ধু সহযোগীরা বললেন, 'কি সর্তে?'

ইন্দিরা বলল, 'ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা আপাতত ওড়ানো হবে না।'

পিতৃবন্ধুরা শ্লেষ করে উঠলেন, 'তবে কি ওড়াতে হবে? চাঁদ মার্কা না কাস্তেহাতুড়ি-মার্কা নিশান বুঝি?'

ইন্দিরা মৃদু হেসে বলল, 'না তাও নয়। কোন নিশানের কথাই আজ উঠবে না। আজ প্রতীকের দরকার নেই আমাদের, তার বদলে মানুষকে পেয়েছি।'

অনেক আপত্তি উঠল। বিনয়ের দলের কেউ কেউ চলেও গেল জায়গা ছেড়ে। কিন্তু খানিকটা ইতস্তত করে শচীবিলাস শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালেন একটা টেবিলের ওপর, 'বন্ধুগণ।'

তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে শচীবিলাস আবার উচ্চতর কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধুগণ!'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হোল আজকের দিনে শূন্য তাঁর হাত। দৃঢ় হস্তে জাতীয় পতাকা তিনি সকলের সামনে তুলে ধরতে পারেননি। লোকে কানাকানি করছে এটা তাঁর নিতান্তই সন্তান-বাৎসল্য। তিনি জানেন তা ঠিক নয়। এ তাঁরি স্বদেশ আর স্বজনবাৎসল্যও বটে। বক্তব্যটুকু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য অভ্যাস বশে পলকের জন্য একটু চোখ বুঝলেন শচীবিলাস। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে মুখে তাঁর গভীর প্রশান্ত পরিতৃপ্তি ফুটে উঠল। আর কোন ক্ষোভ নেই, কোন বেদনা নেই তাঁর অন্তরে।

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা দুলে দুলে উঠছে মৃদু হাওয়ায়। মাঝখানটায় খদ্দরের পবিত্র শুভ্রতা আর দুইপাশে হরিত হলুদের ঢেউ।